১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

জন্ম: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ মৃত্যু: ১০ নভেম্বর ১৯৮৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

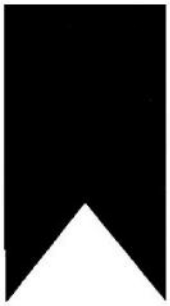

তথ্য ও প্রচার বিভাগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

Doshoi November '83 Swarane

প্রকাশকালঃ
১০ নভেম্বর ২০০৯

Published on:
10 November 2009

প্রকাশনায়ঃ
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Published by:
Department of Information and Publicity
Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti

যোগাযোগঃ
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

Contact:
Department of Information and Publicity
Central Office
Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti
Kalyanpur, Rangamati
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh

টেলিফোন ও ফ্যাক্সঃ +৮৮০-৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইলঃ pcjss.org@gmail.com
Web: www.pcjss-cht.org

Tel & Fax: +880-351-61248
E-mail: pcjss.org@gmail.com
Web: www.pcjss-cht.org

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ২০.০০ টাকা

Price: TK. 20.00 only

সম্পাদকীয়

১০ নভেম্বর ২০০৯ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা)-র ২৬ তম মৃত্যুবার্ষিকী তথা জুম্ম জাতির জাতীয় শোক দিবস। ১৯৮৩ সালের এই দিনে দিবাগত রাতে সাবেক সংসদ সদস্য, জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা তথা জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা এম এন লারমা তাঁর আটজন সহযোদ্ধাসহ বিভেদপন্থী, অপরিণামদর্শী, ষড়যন্ত্রকারীদের অতর্কিত হামলায় শহীদ হন। তথাকথিত 'দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই' এর শ্লোগান তুলে 'গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ' চক্র দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে এবং নিজেদের ক্ষমতালোভকে ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার মানসে পার্টির মধ্যে আত্মঘাতী-ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের সূচনা করে।

মহান নেতা এম এন লারমা জাতীয় জীবনের সম্ভাব্য দুর্যোগ ও বিপর্যয় উপলব্ধি করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের স্বার্থে 'ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া' নীতির ভিত্তিতে ঐক্য-সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকার নির্দেশনা দেন। কিন্তু অপরিণামদর্শী ও ষড়যন্ত্রকারী 'গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ' চক্র এই 'মহান নীতি'কে ভ্রুক্ষেপ না করে আন্দোলন ও জুম্ম জাতিকে বিপর্যয়ের দিকে নিক্ষেপ করে থাকে। যে নেতা অচেতন জুম্মদের আলোর সন্ধান দিয়েছেন, অবহেলিত, অপমানিত, বঞ্চিত জুম্মদের ন্যায্য অধিকারের জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি যুগিয়েছেন, নিজের স্বর্বস্ব ত্যাগ করে নিপীড়িত জুম্ম জাতির মুক্তির জন্য এগিয়ে এসেছেন, সেই মহান নেতাকে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

কিন্তু সত্যের জয় অনিবার্য, সত্যকে ক্ষতি করে মিথ্যাকেই কেবল বরণ করা যায়। তাই এম এন লারমাকে হত্যা করে হত্যাকারী বিশ্বাসঘাতক চক্র নিজেদেরই পরাজয় ডেকে আনে। যেই না তারা এম এন লারমাকে হত্যা করেছে, সাথে সাথে তারা নিজেদেরই কবর রচনা করে এবং নিজেদেরকে অনন্তকালের জন্য ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। অপরদিকে এম এন লারমার যোগ্য উত্তরসূত্রী তারই সহোদর জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)-র নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি অচিরেই ঐক্যবদ্ধ হয় এবং জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে দ্রুত পার্টি তার কার্যকরী ক্ষমতা অর্জন করে এবং অচিরেই ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়।

তৎপরবর্তী পার্টি আবার সন্তু লারমার নেতৃত্বে এম এন লারমার প্রদর্শিত পথ ধরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে দুর্বার গতিতে স্বাধিকারের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। একদিকে আপোষহীন সংগ্রাম, অপরদিকে সংলাপের পথ উন্মুক্ত রেখে আরও এগিয়ে যায় পার্টি। একপর্যায়ে শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয় রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য জনসংহতি সমিতির সাথে আলাপ-আলোচনায় বসতে। ফলে, জাতীয় পার্টি, বিএনপি ও সর্বশেষ আওয়ামীলীগের সাথে ধারাবাহিক আলোচনার সূত্র ধরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকারের সাথে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং অনেক আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে অর্জিত এই চুক্তির বাস্তবসম্মত ও যথাযথ মূল্যায়ন ব্যতিরেকে এবং তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ধুঁয়ো তুলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'কে বিরোধীতা করে বসে ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে হঠাৎ গজিয়ে উঠা ইউপিডিএফ। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এই ইউপিডিএফ জুম্ম জাতির ঐক্যকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করতে থাকে, দীর্ঘ সংগ্রামে ত্যাগী বীর নিরস্ত্র জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সমর্থকদের হত্যায় মেতে উঠে এবং আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকে। শুরুতে লোক দেখানো কিছু কিছু ভালো কথা বললেও ইতোমধ্যে এই সংগঠন মূলতঃ এক সন্ত্রাসী, গন্ডগোল সৃষ্টিকারী, চাঁদাবাজ ও জনবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

অতি সাম্প্রতিক কালেও তারা জনসংহতি সমিতির নিরস্ত্র সদস্যকে খুন ও অপহরণসহ নারী-পুরুষ অনেক সাধারণ মানুষকেও হয়রানি ও মারধর করেছে। গত ২ অক্টোবর ২০০৯ সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকায় চুক্তি বিরোধী এই ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাগত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য এবং বর্তমানে সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার সহ সভাপতি বিমলানন্দ চাকমা ওরফে গালিভারকে (৬২) রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার কেরংছড়ি গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, বিমলানন্দ চাকমাকে মেরে ফেলা হয়েছে। গত ২৩ অক্টোবর ২০০৯ ইউপিডিএফ-এর একটি সন্ত্রাসী দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন খেদারমার ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক ও খেদারমারা ইউনিয়নের উত্তর পাবলাখালী গ্রামের বাসিন্দা টিপু চাকমা (৩৩) পীং ইন্দ্রসেন চাকমাকেও শিজক বাজার থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। নিজেদের ভ্রান্ত পথ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড পরিহার করে যদি এই ইউপিডিএফ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে না আসে তাহলে লড়াকু ও সংগঠিত জুম্ম জনগণ অচিরেই অতীতের বিভেদপন্থীদের ন্যায় তাদেরকে উৎখাত করতে বাধ্য হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি জুম্ম জাতির মুক্তির সনদ। জুম্ম জনগণ তাদের স্বীকৃত ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন চায়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিষদকে কার্যকর করা হয়নি, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তীরণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা হয়নি, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি, অস্থায়ী সেনাক্যাম্পগুলো কবে নাগাদ প্রত্যাহার করা হবে তা ঘোষণা করা হয়নি। চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ভূমি কমিশন আইনের ১৯টি ধারা এখনও সংশোধন করা হয়নি। আর ভূমি কমিশনকে কার্যকর করে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার উদ্যোগও এখনও নেয়া হয়নি। অপরদিকে, সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান চুক্তি মোতাবেক ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির কাজে হাত না দিয়ে ভূমি জরিপ শুরুর ঘোষণা দেন, যা জনসংহতি সমিতি, পার্বত্যবাসী ও সচেতন মহলকে অবাক করেছে। জনসংহতি সমিতি ইতিমধ্যে কমিশন চেয়ারম্যান কর্তৃক ভূমি জরিপের সিদ্ধান্তকে বাতিলের দাবী জানিয়েছে। জনসংহতি সমিতি আশা করে, সরকার অবিলম্বে চুক্তির অবশিষ্ট ধারাগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ ঘোষণা করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ♦

সূচীপত্র

বিশেষ রচনা

মহান নেতা এম এন লারমা ঃ তাঁর চিন্তা ও কর্ম সজীব চাকমা

কবিতা

দুর্বার ১০ নভেম্বর জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু
তোমার মূর্তি তোমার স্মৃতি জড়িতা চাকমা

প্রবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ঃ সমস্যা ও আশু করণীয় মঙ্গল কুমার চাকমা
ভূমি সমস্যা ঃ বান্দরবান জেলায় ভূমি লীজ, অধিগ্রহণ, R কবুলিয়ত ও জবরদখলের প্রেক্ষিত চিংহ্লা মং চাক

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধন ও ভূমি জরিপ প্রসঙ্গে
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন পুনর্গঠন ও বাংলাদেশ সফর

সংবাদ প্রবাহ

"পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ (মারমা), ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরং ও চাক- এই দশটি ছোট ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে 'পাহাড়ী' বা 'জুম্ম' জাতি বলি।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকো বেয়ে দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয় তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"আমাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত দাবী। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে বৃটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সবসময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল; অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা- পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার কাছে বিশ্বয়।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

মহান নেতা এম এন লারমা ঃ তাঁর চিন্তা ও কর্ম

সজীব চাকমা

এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি ছিলেন একজন জনদরদী ও পথিকৃৎ সাংসদ। এটাও সত্য যে, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথিকৃৎ, শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনিই ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের প্রথম রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নেতা। তিনিই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য দাবী জানান। এক পর্যায়ে তাঁর নেতৃত্বেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সহজ, সরল, নিরীহ মানুষ অস্তিত্ব রক্ষা ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়।

বলা বাহুল্য, অধিকার আদায়ের জন্য এম এন লারমা প্রথমে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়, আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতেই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন, ন্যায্য অধিকার ও দাবী-দাওয়া আদায় করতে চেয়েছিলেন। তিনি কখনোই যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করতে যাননি। তাই তিনি প্রথমেই লিখে, প্রচার-প্রচারনা চালিয়ে, সাংসদ হয়ে আলাপ-আলোচনা করে, গণতান্ত্রিকভাবে মানুষকে সংগঠিত করে এবং সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করে, যুক্তি উপস্থাপন করে দাবী আদায় করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আর তিনি কখনো তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সংগঠন করেননি। তা না হলে তিনি সরকারের কাছে রাষ্ট্রের অখন্ডতা স্বীকার করে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন দাবী-দাওয়া করতেন না, এজন্য আবেদন-নিবেদন করতেন না। সংসদ সদস্য হয়ে দেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য সংসদে এত দরদ দিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতেন না। তিনি বাংলাদেশের মধ্যেই এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাইবোনদের সাথে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে জুম্ম জনগণের জন্য স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ১৯৭২ সালে পেশকৃত বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবীর আবেদনপত্রের উপসংহারে লিখেছিলেন, 'আমাদের বাংলাদেশ এখন মুক্ত। ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল ভেঙে গেছে। এখন আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ চারটি মূলনীতি- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে উর্ধ্বে তুলে ধরে উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাইবোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তরের অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবেন।'

জুম্মদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করলেও এম এন লারমা বাঙালী বিদ্বেষী বা সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাই তাঁর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, এমনকি সশস্ত্র আন্দোলনও প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর বিরুদ্ধে ছিল না। বরঞ্চ, কলেজ জীবন থেকে সংসদীয় জীবন পর্যন্ত তাঁর বরাবরই বাঙালী বন্ধুদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাপ্তাই বাঁধ এর ব্যাপারে বিরোধীতার জন্য কারাভোগের পর ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ মুক্তি লাভ করলে সেদিন জুম্মরা সংবর্ধনার জন্য আসতে পারেনি। বরং বাঙালী বিপ্লবী বন্ধুরাই চট্টগ্রামের জেএমসেন হলে তরুণ ছাত্রনেতা এম এন লারমার সম্মানে বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করে। জানা যায়, অকৃত্রিম এই মানুষটি জুম্মদের স্বাধিকারের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথে একমত হতে না পারলেও এবং নানা বিতর্কে অবতীর্ণ হলেও তিনি রাঙ্গামাটি থাকা অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট যখন বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন তখন তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন এবং চোখের পানি পর্যন্ত ফেলেছিলেন।

এম এন লারমা সাধারণ বা গতানুতিক রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা। তিনি কেবল সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী হওয়ার জন্য বা নিজের বা কোন গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য রাজনীতি করেননি। সমাজের বা সমাজের মানুষের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্যই রাজনীতি করেছেন। পশ্চাদপদ সামন্ততান্ত্রিক জুম্ম সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন সাধনের জন্যই রাজনীতি করেছেন। বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা বলেই তিনি কেবল ক্ষমতায় যাওয়া না যাওয়া নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকেননি। সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবেশ, জীবজগত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছেন।

মানুষ চিন্তা করে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবনের বাইরে মানুষ, সমাজ, জাতি, জীবন ও জগত, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাশীল মানুষ ক'জন পাওয়া যায়? আর অন্যায়-অসঙ্গতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো, ন্যায়নিষ্ঠ ও সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা করবো- এমন চিন্তার অধিকারী মানুষতো বরাবরই অল্প। কাজেই কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা সহজ কাজ নয়। আর সঠিক চিন্তাধারা আয়ত্ত করাতো আরও কঠিন। সর্বোপরি, সেই চিন্তাধারা কাজে প্রয়োগ করা, অনুশীলন করা, সেই অনুযায়ী আচরণ

করা এবং বাস্তবায়ন ঘটানো তো আরও দুরুহ এবং জটিল এক ব্যাপার। এম এন লারমা সেই বিপ্লবী নেতা যিনি সঠিকভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে তা অনুশীলন করেছিলেন এবং বাস্তব প্রয়োগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বর্তমান রচনায় তাঁর চিন্তাধারার কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং কিছু কর্মকান্ড স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে মাত্র। উল্লেখ্য যে, এম এন লারমা বেঁচেছিলেন মাত্র ৪৩ বছরের একটু বেশী। ক্ষণজন্মা এই বিপ্লবী নেতা তাঁর নাতিদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তেমন লেখালেখি করে যেতে পারেননি। বিশেষ করে রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময় গেরিলাযুদ্ধের কারণে আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হওয়ায় হয়ত লেখালেখি সম্ভব হয়নি। আর যাওবা হয়েছে সেসবও সংরক্ষণ করা কঠিন হয়। কিন্তু বেশ কয়েক বছরের নিরলস নিয়মতান্ত্রিক ও গেরিলা জীবনে অগণিত মানুষ ও সহযোদ্ধা-কর্মীর কাছে রেখে যাওয়া তাঁর নানা কথাবার্তা, উক্তি, পরামর্শ, নির্দেশনা, বক্তব্য এবং তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতাই আজ তাঁর সর্বশেষ স্বাক্ষী।

স্বদেশ বা স্বভূমির প্রতি প্রেম এবং স্বজাতির প্রতি প্রেম যে কোন সভ্য ও ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। স্বদেশ বা স্বজাতিকে লালন, পালন ও সুরক্ষা মানুষের কাছে বীরোচিত এক দায়িত্ব-কর্তব্য। তরুণ বয়স থেকেই এম এন লারমা জন্মভূমির প্রতি ও স্বজাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ অনুভব করতেন। স্বজাতির পশ্চাদপদতায় ও দুর্দশায় ব্যথিত হতেন। উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়া অবস্থাতেই গ্রামের নেতৃস্থানীয় নারী-পুরুষ বা বয়োজ্যেষ্টদের কাছে স্বজাতির সমাজ, সংস্কার, রীতি, নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে মনোযোগ সহকারে জানতে চাইতেন। কাপ্তাই বাঁধের ফলে যে জন্মভূমি ও স্বজাতি বিরাট বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে একমাত্র তিনিই তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য তিনি সেই তরুণ বয়সেও তৎকালীন স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের আমলে কাপ্তাই বাঁধ নির্মানের বিরুদ্ধে লিফলেট লিখে ছাপিয়ে বন্ধুদের সহায়তায় প্রচার করেছিলেন এবং এজন্য তাকে কারাবরণও করতে হয়।

কাপ্তাই বাঁধের দরোজা বন্ধ করার সাথে সাথে ধীরে ধীরে যখন গ্রামের পর গ্রাম ডুবে যাচ্ছিল এবং এক পর্যায়ে এম এন লারমাদের বাড়ীও গ্রাস করতে শুরু করল, ঠিক তখনি এম এন লারমা বাড়ীর দেয়াল থেকে এক খন্ড আর উঠোন থেকে আরেক খন্ড মাটি তুলে আনলেন। পরে সেই মাটি কাগজে ভালোভাবে মুড়িয়ে দিদির কাছে দিলেন এবং বললেন, এই মাটি অমূল্য জিনিস। তিনি কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ করতেন না। কিন্তু কেউ যদি স্বজাতির নামে অসম্মানজনক ও অবজ্ঞাসূচক কথা বলতো তাহলে তার প্রতিবাদ না করে থাকতে পারতেন না। মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তেও তিনি স্বজাতির কথা ভাবতে ভূলে যাননি। ঘাতকদের অতর্কিত হামলায় প্রথম দফায় তিনি আহত হয়ে পড়েছিলেন। ঘাতকদের কয়েকজনকে সামনে পেয়ে মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে তিনি বলেছিলেন, 'কি, তোমাদের ক্ষমা করে আমরা অন্যায় করেছি? আমাকে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের মেরে জাতি কি মুক্ত হবে? যাক, তোমরা প্ররোচিত ও উত্তেজিত হয়ে যাই করো না কেন জাতির দুর্দশাকে তোমরা কখনো ভূলে যেও না আর জাতির এ আন্দোলনকে কখনো বানচাল হতে দিও না।'

এম এন লারমাই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবীটি জোরালোভাবে তুলে ধরেন। ১৯৭২ সালে তিনি প্রথমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে এবং বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির বরাবরে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানান। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির বরাবরে লিখিত স্মারকলিপিতে তিনি বলেন, 'বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই।' এতে আরও বলেন, 'জনগণের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্বা যথেষ্ট নয়। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তাবোধ এনে দিতে পারেনি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা যাবে না। ... সুতরাং- ক) আমরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সত্বেও পৃথক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পেতে চাই। খ) আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার থাকবে, এরকম শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন চাই। গ) আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই। ঘ) আমাদের জমি স্বত্বা জুম চাষের জমি ও কর্ষণযোগ্য সমতল জমির স্বত্বা সংরক্ষিত হয় এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই। ঙ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন কোন বসতি স্থাপন করতে না পারে তজ্জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন চাই। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের স্বকীয় সংস্কৃতি, জন্মভূমির অস্তিত্ব ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই দাবী ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবী। পরবর্তীতে স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত এই দাবীর ভিত্তিতেই জনসংহতি সমিতিও তার আন্দোলন পরিচালনা করে এবং সংলাপ চালায়।

তিনি সংসদের ভেতরে ও বাইরে বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও স্বায়ত্তশাসন আদায়ে ছিলেন সদা সোচ্চার। পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসন কাঠামো এবং জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে সংবিধানে সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। তিনি ১৬ সদস্যের এক জুম্ম প্রতিনিধিদল নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেও দেখা করেন। এছাড়া তিনি ২ নভেম্বর ১৯৭২

সংবিধান বিলে '৪৭ক' নামে নতুন অনুচ্ছেদের সংযোজনী প্রস্তাব এনে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। উক্ত সংযোজনী অনুচ্ছেদে তিনি প্রস্তাব করেন যে—

"৪৭ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হইবে।"

এই প্রস্তাবের পক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি সেদিন গণপরিষদে ঐতিহাসিক যুক্তি তুলে ধরেন। সেসময় গণপরিষদে একমাত্র তিনিই ছিলেন নির্দলীয় ও অ-আওয়ামীলীগ সদস্য। তবু কোনোরূপ ভয়ভীতিকে তোয়াক্কা না করে অকুতোভয় চিত্তে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক দাবি তুলে ধরেন। তিনি বলেন—

"মাননীয় স্পিকার সাহেব, পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ (মারমা), ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরং ও চাক—এই দশটি ছোট ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে 'পাহাড়ী' বা 'জুম্ম' জাতি বলি। ...বৃটিশ বাংলাদেশকে শাসনের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ-এ 'চিটাগং হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন'-এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক—সবকিছু দেখাশুনার ভার বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেয়। ...১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইনে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের 'চিটাগং হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন' দ্বারা পরিচালনা করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারপর বৃটিশ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে পুনর্বার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐ রেগুলেশনের দ্বারা শাসন করার স্বীকৃতি প্রদান করে। তারপর পাকিস্তানের সময়ও ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত—প্রথম সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত—সেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারাই পরিচালনা করা হয়। তারপর ১৯৫৬ সালের প্রথম সংবিধান এবং স্বৈরাচারী আইয়ুবের ১৯৬২ সালের সংবিধানেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐ রেগুলেশনের দ্বারা শাসিত এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।..."

কিন্তু সেদিন এম এন লারমার কোনো যুক্তি বা ঐতিহাসিক ভিত্তি কোনোটাই তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর মনে দোলা দিতে পারেনি। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর উগ্র জাতীয়তাবাদী দাম্ভিকতায় জুম্ম জনগণের সকল ন্যায্য দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। কিন্তু দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ, সকল জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি সময়ের দাবিতে বর্তমানে আরো বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

১৯৯৭ সালে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১নং ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, "উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।" এই অঞ্চলের আদিবাসী জুম্ম (উপজাতি) অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যতম জরুরী বিষয় হচ্ছে এসব জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

বহু জাতির সমাহারেই মানবজাতি। তাই মানবাধিকার ঘোষণায় সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। বস্তুতঃ আধুনিক যগে জাতীয়তাবোধহীন কোন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু প্রত্যেক জাতিই তাঁর স্বকীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতিনীতি নিয়ে বাঁচতে ও বিকশিত হতে চায়। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠীর জাতীয় বিকাশের পথ। একটি জনগোষ্ঠীর মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে যেতে গেলে জাতীয় বিকাশের পথে, জাতীয়তাবাদের পথে এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পথেই যেতে হয়। বাঙালী জনগোষ্ঠীর বিকাশের পথ এই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পথে তথা সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের পথে যেতে হয়েছে। তবে, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বা জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্য সার্বভৌম রাষ্ট্র সবসময় অপরিহার্য নয়। সামন্তবাদ কখনো জাতীয়বাদের বিকাশ ঘটাতে পারেনা। এমনকি জাতীয়তাবাদের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই জাতীয়তাবাদ বিকাশের জন্য, একটি জাতির বিকাশের জন্য সামন্তবাদের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করতে হয়, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়, জাতীয় সংগঠন সংগঠিত করতে হয়। বলা বাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি বা দুটি জাতিগোষ্ঠী নয়, ডজনখানেক জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের রয়েছে প্রত্যেকের স্বকীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য। এই গুলি অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ সামন্তবাদের দ্বারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সামন্তবাদ সবসময়ই নিজেকে নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকে, বৃহত্তর সামাজিক প্রগতিতে এগিয়ে আসে না। তাই সামন্তবাদ কখনোই এই ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলিতে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি করতে পারেনি এবং শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-আগ্রাসনকে রুখে দাঁড়াতে পারেনি। অপরদিকে বিভিন্ন বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী বরাবরই এই জাতিগোষ্ঠীগুলোকে 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতি অবলম্বন করে এসেছে। এই জাতিগোষ্ঠীগুলোকে এম এন লারমাই জাগরিত করেন, ঐক্যবদ্ধ করেন এবং জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত করেন।

এম এন লারমাই জুম্ম জাতীয়তাবাদের স্থপতি এবং জুম্ম জাতীয়তাবোধের মূর্ত প্রতীক। জুম্ম জাতীয়তাবাদী হতে গেলে এবং জুম্ম জাতীয়তাবাদ বিকশিত করতে গেলে কি করতে হবে তাও যেন তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন নিজের মধ্য দিয়ে। তবে, এটা স্মরণ রাখতেই হবে যে, জুম্ম জাতীয়তাবাদও জাতীয়তাবাদ বটে, কিন্তু এ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়, উগ্র জাতীয়তাবাদও নয়, এমনকি পুরনো ধারার একক জাতি, ধর্ম বা শ্রেণীর কোন জাতীয়তাবাদও নয়। বস্তুতঃ এ এক বহু জাতির, বহু ধর্মের, বহু শ্রেণীর সম্মিলিত

এক জাতীয়তাবাদ; দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্র ও বৃহৎ শক্তির দ্বারা অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত একাধিক সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদ এবং সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু কিংবা অগ্রসর-পশ্চাদপদ প্রত্যেক জাতি বা জাতিগোষ্ঠীকে স্বীকার করে, সহযোগিতা করে এবং প্রত্যেকেই মানুষ হিসেবে সমান বিবেচনা করে সংহত এবং সংগঠিত হয়ে স্বাধিকার আদায়ে সংগ্রামরত এক জাতিগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদ। ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, ঐতিহ্যগত ভিন্নতা এবং শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও, সর্বোপরি ভাষাগত, সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও যে একাধিক জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং একই সাধারণ জাতীয় পরিচয়ে পরিচিত হতে পারে জুম্ম জাতীয়তাবাদ তারই এক উদাহরণ। বস্তুতঃ জুম্ম জাতীয়তাবাদ, প্রগতিশীল ধারার এক জাতীয়তাবাদ। পৃথিবীর জাতিতে জাতিতে যে দ্বন্দ্ব, সমস্যা তাঁর সমাধানও যেন জুম্ম জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় সূত্রবদ্ধ রয়েছে।

এম এন লারমার চিন্তাধারার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁর নিপীড়িত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ এর ভাষায় 'যে কোন সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করেছেন মানবেন্দ্র লারমা।' গরীব চাষী ও ভূমিহীন তথা সমাজে যারা সবচেয়ে গরীব ও অসহায়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাদের সকলের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী দয়াশীল। দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিলে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকতেন। তাই তিনি যেখানে গেছেন সেখানে অসহায় গরীবদেরকে সীমিত সাধ্যের মধ্যেও সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মীরা আসলে তাদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অবস্থা সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন। সহযোদ্ধাদের সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিতেন। একবার পাহাড়ী জুম বেয়ে পথ চলতে চলতে জীর্ণশীর্ণ এক ত্রিপুরা জুমচাষীকে দেখতে পেয়ে সহযোদ্ধাদের দেখিয়ে বললেন, 'ভাতের অভাবে তাকে মনে হয় এমন দেখাচ্ছে। যাও তাকে কিছু দিয়ে এসো।' তখন তাঁর রুকসেক থেকে ৩০০ টাকা বের করে এক সহযোদ্ধার হাতে দিয়ে ঐ চাষীকে দিয়ে দিতে বললেন এবং পরে অসুবিধায় পড়লে সে যেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে সে কথাও জানাতে বললেন। এমনকি গেরিলা জীবনে কোন জুমের কাছাকাছি থাকার সময় নিজের পরিশ্রম দিয়েও জুমিয়া পরিবারকে সহযোগিতা করেছেন। বলা বাহুল্য, জনসংহতি সমিতির সার্বক্ষণিক কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর অথবা স্বল্প শিক্ষিত। তিনি এদেরকে নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। দলীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি এদের জন্য পার্টিতে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি নিজে এসব সহকর্মীদের লেখাপড়া শেখাতেন এবং রাজনৈতিক ক্লাশ পরিচালনা করতেন। তিনি শুধু জুম্ম সাধারণ মানুষের কথা বলেননি, নিপীড়িত, নির্যাতিত বাঙালীর অধিকারের কথাও বলেছেন। তিনি যখন সাংসদ ছিলেন, তখন সংসদে তিনি দেশের শ্রমিক, কৃষক, রিকশাওয়ালা, মেথর, জেলে ইত্যাদি মেহনতী মানুষের অধিকারের কথা, সংবিধানে তাদের অধিকার বিশেষভাবে অন্তর্ভূক্ত করার কথাও তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে দরদ দিয়ে তুলে ধরেছেন।

সাংসদ হিসেবেও এম এন লারমা ছিলেন অত্যন্ত সরব। বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁকে কাছে থেকে দেখেছেন। তাঁর ভাষায়, 'মানবেন্দ্র লারমা চমৎকার বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। সংসদে বিরোধী দলের কণ্ঠ বলতে তখন আতাউর রহমান খান, ভাসানী ন্যাপের সৈয়দ কামরুল ইসলাম, মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন, আব্দুল্লাহ সরকার, কুমিল্লা থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচিত আলী আশরাফ এবং মানবেন্দ্র লারমাকেই বোঝাতো। সরকারী দলের সাংসদদের চেয়ে তাঁদের বক্তব্যকেই সাংবাদিকরা বেশী মূল্য দিতেন। তাঁরা কক্ষে কিছু বললেই সেটা সংবাদ হতো।' সৈয়দ মকসুদ আরও লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের উপস্থিতিতে তিনি পার্বত্য জনগণের নানা সমস্যার কথা ও দাবী দাওয়া কঠোরভাবেই উপস্থিত করতেন, পার্লামেন্টে যেমন হওয়া উচিত। আবার অধিবেশনের পরে বারান্দায় বা করিডোরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হাস্য-রসিকতাও করতেন। আমার কষ্ট হয়, তাঁর রাজনীতি ভিন্ন পথে না গেলে তিনি বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে একজন বড় ও দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হতে পারতেন। সে যোগ্যতা তার পুরোপুরি ছিল।' এখানে উল্লেখ্য যে, সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে সংসদে তিনি কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর কথা তুলে ধরেননি, গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা, বাংলাদেশের মাছ, যুদ্ধবন্দী বিচার, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল, ১৯৭৩, রেলওয়ে বাজেট, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষী, ব্যাংক ডাকাতি, বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকা ও কাঁচা রাস্তা, কর্ণফুলীতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ, পল্লী বিদ্যুতায়ন, পাকশী কাগজের কল, বেতারে বিরোধী দলীয় মতামত প্রকাশের সুযোগ, জাহাজ থেকে চেউটিন আত্মসাৎ, আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ, মেডিক্যাল কলেজ ও অধ্যাপক, ভবঘুরে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা উন্নয়ন, শিক্ষক কল্যাণ ভাতা, বনজ সম্পদের উন্নয়ন, হাসপাতাল, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়ামসহ দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আলোচনা ও প্রস্তাব রেখেছেন।

বাংলাদেশ ও সংসদে গণতন্ত্রায়ন, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠায়ও তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। সংসদে প্রথমে কেবল পবিত্র কোরান ও পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করা হতো। তিনিই প্রথম বহুধর্মের দেশ ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বাংলাদেশের সংসদে কোরান ও গীতা পাঠ হলে, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক ও খ্রীষ্টানদের বাইবেল থেকে পাঠ হবে না কেন এই প্রশ্ন তোলেন। ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল এই প্রসঙ্গে সংসদে তিনি বলেন, 'মাননীয় স্পীকার, শপথ গ্রহণের আগে আমাদের দিনের কর্মসূচী যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন পবিত্র কোরান থেকে 'সুরা' পাঠ এবং গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করা হয়েছে। এখন আপনার মাধ্যমে এই পরিষদের নিকট আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এই পরিষদে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক প্রতিনিধিত্ব করছি। বাংলাদেশে শুধু হিন্দু

ধর্মাবলম্বী বা শুধু ইসলাম-ধর্মাবলম্বী লোক নাই- বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকও আছেন। মাননীয় স্পীকার এখন আমার প্রশ্ন হল যে, কেবল পবিত্র কোরান পাঠ এবং গীতা পাঠ করা হবে, না বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ত্রিপিটক এবং খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বাইবেল থেকেও পাঠের প্রয়োজন আছে?' এম এন লারমা এই প্রশ্ন তোলার পর তৎকালীন আইনমন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে নীতিগতভাবে লারমার যুক্তি স্বীকার করেন এবং ত্রিপিটক ও বাইবেল থেকেও পাঠ করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

১৯৭৩ সালের জুন মাসে আবার অধিবেশন বসলে সেখানে যখন আবার ত্রিপিটক ও বাইবেল থেকে পাঠ করা হল না, তখন তিনি আবার বিষয়টি উত্থাপন করেন। ১৯৭৪ সালের ১৫ জানুয়ারী সংসদ অধিবেশন শুরু হলে, তাতে কোরান, গীতা ও ত্রিপিটক থেকে পাঠ হলেও বাইবেল থেকে বাদ দেয়া হলে আবারও তিনি বিষয়টি উত্থাপন করেন এভাবে, 'আজকে এই মহান জাতীয় সংসদে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত, গীতা পাঠ এবং ত্রিপিটক পাঠ হল বটে কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বাইবেল পাঠ করা কেন হল না? খ্রীষ্টানরাও বাংলাদেশের নাগরিক।..বাংলাদেশের খ্রীষ্টান নাগরিকদেরও জাতীয় সংসদে ধর্মীয় অধিকার রয়েছে।' এভাবে সংসদে বৌদ্ধদের ত্রিপিটক ও খ্রীষ্টানদের বাইবেল পাঠ শুরু হল। সত্যিকারের নিঃস্বার্থ, বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন সাংসদ বলেই এ সব সম্ভব হয়েছে।

এম এন লারমার চিন্তাধারার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর পরিবেশগত চেতনা, পরিবেশের ভারসাম্য নিয়ে তাঁর চিন্তাধারা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে উপলব্ধি। প্রকৃতির প্রতি একদিকে ছিল তাঁর সহাজাত প্রেম, অপরদিকে মানুষের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ পরিমিতিবোধ। অপ্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। আজকে দেশে দেশে, এমনকি বৈশ্বিকভাবে যেভাবে জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিষয়টি উঠে আসছে অথবা মানুষ অস্তিত্বের প্রয়োজনে বিষয়টি তুলতে বাধ্য হচ্ছে, তাতে আমাদের এম এন লারমার কথাই স্মরণে আসে। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে জলবায়ুর পরিবর্তন, প্রাকৃতিক পরিবেশের যে অবনতি, বিভিন্ন প্রজাতির যে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, কয়েক প্রকার মৎস্য প্রজাতির দ্রুত অবলুপ্তি, এককালে চঞ্চল ঝিরি-ঝরণাগুলোর যে আজকে শুকিয়ে মরার অবস্থা, তাতে এম এন লারমাকে স্মরণ না করে পারা যায় না।

অনেক আগে সার্বিকভাবে পশ্চাদপদ এক সমাজে থেকে এবং প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ ও সমৃদ্ধ এক প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকেও তিনি পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ে কত সংবেদনশীল ও বৈজ্ঞানিক চেতনায় ঋদ্ধ ছিলেন! কোন প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী না থাকলেও তিনি এ বিষয়ে কত দূরদর্শী ও পথিকৃৎ ছিলেন! অপ্রয়োজনীয় গাছ-বাঁশ তিনি কাটতে দিতেন না। তিনি বলতেন, 'এ সব আমাদের জাতীয় সম্পদ। তাছাড়া গাছ-বাঁশ প্রকৃতির শোভা যেমনি বৃদ্ধি করে, তেমনি আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষা করে।' তাই কোন কারণে জঙ্গলে ঘুরতে গেলেও অহেতুক গাছ-বাঁশ না কাটার নির্দেশ দিতেন তিনি। দুর্লভ পশু-পাখি বধ করা ছিল নিষিদ্ধ। এটা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্টিগতভাবে নির্দেশ জারী করা হয়। 'ধনেশ পাখি, বিরল প্রজাতির পাখি, মাদি হরিণ, বাঘ, ভল্লুক, গয়াল, হাতী, অজগর, গোখরা সাপ, শকজোর (বিষধর বড় সাপ), বানর, জঙ্গলী কুকুর, বিরল প্রজাতির কচ্ছপ, বনরুই, ইয়ো হরিণ (খাড়া পাহাড়ে থাকা এক প্রকার হরিণ) ইত্যাদি পশু-পাখি' সংরক্ষণ করার নির্দেশ পার্টির বিভিন্ন গ্রাম কমিটি ও প্রশাসনিক কমিটিতে পাঠানো হয়। তা অমান্য করলে শাস্তির বিধানও রাখা হয়।

কোন একটা এলাকায় মোটা সূতার জাল দিয়ে পশু শিকার করাও নিষিদ্ধ করা হয়। তবে, পশুদের মধ্যে কেবলমাত্র শুকর শিকারের উপর কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। কারণ, প্রথমতঃ শুকরের বংশবৃদ্ধির হার বেশী। দ্বিতীয়তঃ শুকর জুম ও জমির ফসল বেশী নষ্ট করে। ব্যারাক জীবনে তাঁর বিছানার কিছু দূরে অবস্থান নেয়া এক বিষধর সাপকেও তিনি মারতে দেননি। বলেছিলেন, 'সাপকে ক্ষতি বা আঘাত না করলে বা ভয় না দেখালে সাপ সহজে কাউকে কাটে না। সাপ আপনি থেকেই চলে যাবে।' মাতৃজাতীয় কোন জীবজন্তুও তিনি শিকার করতে দিতেন না। একবার মাছ ধরতে গিয়ে পাওয়া গেল প্রচুর ব্যাঙাচির আস্তানা। সকলের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ব্যাঙাচি ধরার পর তিনি আর ব্যাঙাচি ধরতে বারণ করলেন। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা রাত্রে গমনাগমনের সময় ছড়াপথে কাঁকড়া ধরে দাঁড়গুলো ভেঙে কাঁকড়াগুলো ফেলে রেখে দাঁড়গুলো নিয়ে যেত এবং ব্যারাকে পৌঁছে আগুনে পুড়ে শাঁসগুলো খেত। এম এন লারমা তাও বারণ করতেন এবং বলতেন, 'তোমাদের হাতগুলো কেটে নিলে তোমরা কিভাবে আহার করবে?' তাছাড়া রাতের বেলায় একই জায়গায় ঘন ঘন কাঁকড়া ধরতে বারণ করতেন। রাতের বেলায় কাঁকড়াগুলো গর্তের বাইরে আসে বলে সহজে মানুষের হাতে ধরা পরে এবং কয়েকদিনের মধ্যে ঐ ছড়ায় আর কাঁকড়া পাওয়া যায় না। (লক্ষী প্রসাদ চাকমা) কোন কীটপতঙ্গ যদি অসহায় হয়ে পড়ে থাকে তাহলে তিনি সেটা তুলে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় রেখে দিতেন।

একবার এক জুমচাষী কচ্ছপ পেলে সন্ধ্যায় তা বিক্রি করতে বের হয়। এসংবাদ শুনে ব্যারাকের শান্তিবাহিনীর এক সদস্য তা কিনতে সেখানে উপস্থিত হয়। এই কচ্ছপের খবর এম এন লারমার কানে গেলে টর্চ নিয়ে তিনিও সেখানে উপস্থিত হন। তিনি কচ্ছপটি ভালোভাবে দেখে বলে উঠলেন, 'দেখ দেখ কচ্ছপটি কাঁদছে। এ রকম কচ্ছপতো এখন পৃথিবীতে বোধ হয় খুব কমই দেখা যায়। আমাদের দেশে এরকম আছে তা আনন্দের বিষয়। এদের বংশ মনে হয়ত কমে যাচ্ছে।' এক পর্যায়ে তিনি কচ্ছপটি ছেড়ে দেওয়ার

প্রস্তাব করলেন। অন্যদেরও আর তাঁকে সমর্থন না করার জো থাকল না। জুম্মদের প্রধান পেশা জুম চাষের জন্য জুম পোড়াবার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সচেতন। প্রয়োজনাতিরিক্ত জঙ্গল কাটা ও পোড়ানোতে ছিল তাঁর বারণ। বাতাসের গতি দেখে এবং সবাই মিলে জঙ্গল পোড়ানোর নির্দেশনা দিতেন।

জুম্মদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এম এম লারমাই অবিসংবাদিত নেতা, আধুনিক ও প্রগতিশীল মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের এক মূর্ত প্রতীক। জুম্মদের জাতীয় জীবনে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল, ভদ্র, দয়ালু, ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল, পরোপকারী, কষ্ট সহিষ্ণু, পরমতসহিষ্ণু, গণতান্ত্রিক, ক্ষমাশীল। তিনি ছিলেন সবসময় ঐক্যের পক্ষে, তাইতো তিনি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত জুম্ম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দলের মধ্যেও তিনি ঐক্যের পক্ষে ছিলেন। অথচ বিভেদপন্থী, অপরিণামদর্শী, ক্ষমতালিপ্সু চার কুচক্রীরা দূরদর্শী, নির্ভরযোগ্য, অকৃত্রিম মানবপ্রেমের অধিকারী, জুম্ম জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান এই মহান নেতাকেই হত্যা করল। তাদের এই হত্যাকান্ড আজ ধিকৃত, ঘৃণিত। আর এম এন লারমা অবিস্মরণীয়, বরণীয়, অমর হয়ে থাকবেন আরও দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ। মহান নেতা এম এন লারমা, লও লও লাল সালাম।

"যে যত আদর্শবান, সে তত ক্ষমাশীল, ত্যাগী, সাহসী, বিপ্লবী ও দূরদর্শি হতে পারে।"

---মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"ক্ষমাগুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তিত হওয়ার গুণ-
এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।"

---মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"যারা মরতে জানে পৃথিবীতে তারা অজেয়। যে জাতি বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারে না, পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকতে পারে না।"

---মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

কবিতা

দুর্বার ১০ নভেম্বর

জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু

দুর্বার দশই নভেম্বর
জুম্ম জাতীয় জীবনে ঘুরে এলো;
বিশ্বপথে সবার সাথে সমান তালে
আমাদের এই সবুজ সোনার দেশ
পৃথিবীর বুকে শান্তি স্বর্গ
গিরিভূমি স্বদেশ মাতা জননী জুমিয়ায়
রচিতে চেয়েছে মিলনের সুর বাজিয়ে
এক নামে পরিচয় মোরা জুম্ম জাতি।
রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করে অন্ধকার,
কোন অজানায় সম্ভাবনাময়
শিউলি বকুল ফুল ঝরে পড়ে
শেষ রাত্রির কান্নার মতো
উচ্ছসিত বন্যার বেগে হাতে সমরাস্ত্র
ঝরা ফুলের মরা চোখে
প্রতিশোধ পরায়ণ প্রাণ হন্তা
নরঘাতক এলিন বজ্রকণ্ঠে
একটি কঠোর শব্দ উচ্চারণ করে-
ইয়া আলী- ইয়া আলী- ইয়া আলী
মিলন ক্ষণে একি নিষ্ঠুর বিদ্রোহ!
নিমেষে বিপদ সংকেত
মূহূর্তে কেড়ে নিল জীবন প্রদীপ,
মহামানব লারমার বুক ঝাঁঝড়া করে দিল-
একটি বুলেট বিষের আগুনে।
দৃপ্ত লারমার মনোজগত, মুক্তজীবন দুশ্চিন্তাহীন
মৃত্যু নেই- মৃত্যুতে নেই ক্ষয়,
নেই অবলুপ্তি, নেই বিলয়;
আহ্বানে আসে অনেক দৃঢ় সংকল্প, বজ্র আওয়াজ
১৯৮৩-র ১০ই নভেম্বর
মহান জীবন দান অমর হোক।

তোমার মূর্তি তোমার স্মৃতি

জড়িতা চাকমা

হে মহামানব এম এন লারমা
তুমি সমগ্র নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের চেতনা।
তুমি অসাম্প্রদায়িক, গনতান্ত্রিক, জুম্ম জাতীয়তাবাদী
চির দু:খী মানুষের জন্য তোমার কত মনোবেদনা!
লড়েছো তুমি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে;
গড়েছো তুমি জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনা
হে মহামানব এম এন লারমা।
জুম্ম জাতির জাতিয়তাবাদী চেতনার প্রতীক তুমি
তুমি শুধু নও জুম্ম জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।
ভাবোনিতো তুমি জাতি-বেজাতি-হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান।
সর্বহারা মানুষের প্রতি আজন্ম টান তোমার,
তুমি অধিকারবঞ্চিত মানুষের পবিত্র বীর সন্তান।
তুমি হৃদয়ের, তুমি মানবমুক্তির সঞ্চার
তুমি অমৃত, অধিকার বঞ্চিত মানুষের চির ভাস্বর
হে লারমা, তুমি আজি নেই-
সেই সাথে নেই শুধু একটি প্রাণ,
আছে শুধু অশ্রুধারা, বুকভরা বেদনা।
যদিও ঘাতকরা বদলে দিয়েছে তোমার ঠিকানা
কিন্তু স্তব্ধ করে দিতে পারেনি তোমার জাতীয় চেতনা, প্রেরণা।
হে লারমা, তোমার চেতনার মৃত্যু নেই-
তুমি জাগরণের, অনুরাগের, তুমি চির বিশ্বাসের।
অন্ধকার তাড়িয়ে আলোর পথের যাত্রী তুমি-
নিপীড়িত মানুষের ভালোবাসার দিগ্বিজয়ী।
মরেও বেঁচে আছো তুমি বিপ্লবী গান গেয়ে,
সৃষ্টিশীল তুমি, জুম্ম জাতির মুক্তির দিশারী হয়ে।
স্বপ্ন পুরণের প্রতীক্ষায় ছিলে একদিন তুমি
তরুণ সমাজকে ধবংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছো
সে দিনের কথা ভুলে যায়নি আজি।
তোমাকে হত্যা করেছে যারা, জাতীয় শত্রু তারা
বিশ্বাসঘাতক তারা, দালাল তারা।
মাথা নিচু করে এক পায়ে কেন খাড়া?
শান্তি চায় না তারা, জাতীয় মুক্তি চায় না তারা।
তোমার সিদ্ধান্তের সীমানা পেরিয়ে
অজানার পথে পা বাড়িয়েছে তারা।
আজি তোমার আদর্শ লালন করছে যারা
প্রচন্ড বিপদে - প্রচন্ড ঝড়ঝঞ্ঝাতে
যুগে যুগে বিজয়ের গান, বিজয়ের আশা নিয়ে লড়ছে তারা,
পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য ও স্বপ্নকে পুরণ করতে
কখনো পিছবা হবে না তারা।
আজি দু:সহ স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছো তুমি
তোমার স্মৃতি, তোমার মূর্তি
তোমার মূর্তিতে ফুটে উঠে
শুধু দু:সহ অশ্রু আর বেদনার হাসি।
আজি আমরা হাজারো হাজারো মানুষ- এই দিনে
তোমার অবিস্মরণীয় মূর্তিতে দিতে আসি শ্রদ্ধার পুস্পমাল্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ঃ সমস্যা ও আশু করণীয়

মঙ্গল কুমার চাকমা

১. ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের অধিকার সনদ। এ সনদ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের দীর্ঘ বছরের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম ও কঠোর আত্মত্যাগের ফসল। এ সনদ পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ ও বিলুপ্তপ্রায় জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের ভিত্তি। এ চুক্তি দেশের সংবিধানের আওতায় ও অনুসরণে সম্পাদিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল। প্রাক-উপনিবেশিক আমলে এ অঞ্চলের জুম্ম জনগণ সামন্ত রাজার অধীনে স্বাধীন সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিল। ১৮৬০ সালে এ অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি প্রণয়ন করে ব্রিটিশ সরকার জুম্ম জনগণের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকারও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বলবৎ রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। ১৯৬২ সালে ঘোষিত পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধানেও 'উপজাতীয় অঞ্চল' শব্দ ব্যবহার করে বিশেষ অঞ্চলের স্বীকৃতি দেয়া হয়।

স্বাধীন রাজার আমলে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণ সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-নিপীড়নে নিষ্পেষিত হয়। বৃটিশের শাসনামলে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ যুক্ত হয়ে জুম্ম জনমানুষের জীবন সঙ্গীন হয়ে উঠে। পাকিস্তান শাসনামলে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের শাসন-শোষণের শিকার হয়। আর অধুনা বাংলাদেশের শাসনামলে উগ্র জাতীয়তাবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি-বিদ্বেষী নীতির ফলে জুম্ম জনগোষ্ঠী বিলুপ্তির পথে ধাবিত হতে বাধ্য হচ্ছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জুম্ম জনগণের উপর বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য ও বঞ্চনা অবসানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও স্বাতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে তৎকালীন সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলে ধরেন। কিন্তু জাতিরাষ্ট্রের উগ্র জাতীয়তাবাদে অন্ধ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের সেই দাবী সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। জুম্ম জনগণের ন্যায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এমনি অবস্থায় সরকারও দমন-পীড়নের চরমপন্থা অবলম্বন করে। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ হলে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সশস্ত্র রূপ ধারন করে।

প্রায় আড়াই দশক ধরে সশস্ত্র আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের পথ খোলা রাখে। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদ সরকারের সাথে আনুষ্ঠানিক সংলাপ শুরু হয়। জেনারেল এরশাদ সরকার ও পরবর্তী খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সাথে সংলাপ প্রক্রিয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকারের সাথে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। চার খন্ডে বিবৃত চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো-

(ক) সাধারণ

- পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ী (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনকরণের বিধান করা হয়।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার বিধান করা হয়।

(খ) পার্বত্য জেলা পরিষদ

তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদকে পার্বত্য জেলা পরিষদ নামকরণ করে অধিকতর শক্তিশালীকরণের বিধান করা হয় এবং অন্যান্যের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশ করার বিধান করা হয়-

- অউপজাতীয় (বাঙালি) স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ করা হয়।
- সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান।
- স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন।
- কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করার বিধান এবং এতে জেলার পাহাড়ীদের (উপজাতীয়) অগ্রাধিকার প্রদান।
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।
- পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত করা ও জেলা পুলিশ পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন করা।
- পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ভূমি ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর, অধিগ্রহণে বিধিনিষেধ।
- পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিষদের বিশেষ অধিকার।
- আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), কৃষি ও বন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, যুব কল্যাণ ও আদিবাসী (উপজাতীয়) প্রথাসহ ৩৩টি কার্যাবলী বা বিষয় (চুক্তিতে নতুন ১২টি বিষয়সহ) পরিষদের আওতাধীন করা।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করার বিধান করা হয় এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আওতাধীন করার বিধান করা হয়-

- পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়
- পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়
- সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবলী সমন্বয় সাধন
- আদিবাসী (উপজাতীয়) আইন ও সামাজিক বিচার
- ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান
- ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ
- অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন
- পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা।

(ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করার বিধান করা হয়-

- ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক পাহাড়ী শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন
- আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসন
- ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক পাহাড়ী পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করে দুই একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করা।
- অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নেতৃত্বে ভূমি কমিশন গঠন এবং কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা।
- রাবার চাষের ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা।
- চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য পাহাড়ীদের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা।
- আদিবাসী (উপজাতীয়) কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

- জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান।
- জনসংহতি সমিতির সদস্য এবং সমিতির কাজে জড়িত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার করা।
- জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন করা।
- সীমন্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া এবং এলক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রকার চাকুরীতে পাহাড়ীদের (উপজাতীয়) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা।
- জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং এ মন্ত্রণালয়ে পাহাড়ীদের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা ও মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা ও আশু করণীয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে তৎকালীন সরকার কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন প্রণয়নসহ কিছু বিষয় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে এ চুক্তি বাস্তবায়নের মৌলিক ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপন, ভারত থেকে পাহাড়ী শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্যতম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো- যেগুলোর উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর করে অত্রাঞ্চালে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার মতো মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নির্ভর করে সেসব মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে তৎকালীন সরকার এগিয়ে আসেনি।

গত ২৯ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে মহাজোট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে। আওয়ামীলীগ তার নির্বাচনী ইসতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠন, এক ব্রিগেড সৈন্যসগ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়া ইত্যাদি অন্যতম। এসব পদক্ষেপ মূলতঃ প্রস্তুতিমূলক বলা যায়। চুক্তির প্রায়োগিক বাস্তবায়ন এখনো শুরু হয়নি। পার্বত্যবাসীর প্রত্যাশা যে, নির্বাচনী অঙ্গীকার মোতাবেক বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দিয়ে অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আশু করণীয় উত্থাপন করা গেল-

৩.১. উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ: এই বিধান অনুযায়ী জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সমুন্নত রাখা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এই অঞ্চলের আদিবাসী জুম্ম (উপজাতি) অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যতম জরুরী বিষয় হচ্ছে এসব জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বহিরাগত অনুপ্রবেশ বন্ধ করার সংবিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা দরকার। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে আগের (ব্রিটিশ আমলে) মতো ইনার লাইন প্রথা কার্যকর করা যেতে পারে। এ ছাড়া জরুরী ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক-

(১) সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের ভূমি জবরদখল করার চলমান প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং জরবদখলকৃত জমি জুম্মদের নিকট ফেরত দেয়া।

(২) সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইবে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা; এলক্ষ্যে-
   (ক) সেটেলার বাঙালীদের রেশন বন্ধ করা।
   (খ) সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া।
   (গ) এজন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা।

(৩) জেলা প্রশাসকদের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা বাতিল করা।

(৪) সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ বাতিল করা।

(৫) সেটেলার এবং চাকুরী ও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বসবাসকারী বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করা।

(৬) পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনরূপ ভূমি হস্তান্তর, অধিগ্রহণ ও ইজারা প্রদান না করা।

(৮) পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক জেলার জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া।

(৯) পার্বত্যাঞ্চলের ৩টি সংসদীয় আসন আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণ করা।

(১০) আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি মোতাবেক আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

৩.২. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনকরণের বিধান: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৯৯৮ সালে তৎকালীন সরকার চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে। Rules of Business, 1996-এর Schedule-1 (Allocation of Businesss among the different Ministries and Divisions)-এর অধীনে ১৯৯৮ সালে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতার তালিকার প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।

কিন্তু এরপর থেকে আর এগোয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের সরকার কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে নানা কর্তৃপক্ষ নিজের সুবিধা অনুযায়ী বিধানাবলী ব্যাখ্যা করে নিজের সুবিধা মত প্রয়োগ করছে এবং এক্ষেত্রে নানা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। অধিকন্তু আইন প্রণীত হলেও এখনো উক্ত আইন কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে কার্যবিধিমালা প্রণীত হয়নি।

বলাবাহুল্য চুক্তির তৃতীয় খন্ড 'গ' এর ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে বা ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসঙ্গতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হবে। এছাড়া চুক্তির তৃতীয় খন্ড 'গ' এর ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বা ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করবে। কিন্তু এসব বিষয় হয় উপেক্ষা করে চলেছে নতুবা কার্যকর বাস্তবায়ন থেকে বিরত রয়েছে। এমতাবস্থায় আইন প্রণয়ন বা সংশোধন ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে এ পরিষদের কার্যবিধিমালা চূড়ান্ত করা এবং আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সংযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা কার্যকর করা।

(২) পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকর করার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুমোদন করা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান-সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন করা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়ন করা (স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে)।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করা এবং ভূমি কমিশনের কার্যবিধিমালা প্রণয়ন করা।

(৪) পার্বত্যাঞ্চলের সকল চাকুরীতে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার বিধান কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট আইনে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন করা।

(৫) দেশের কোন সাধারণ আইন বা বিধিমালা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকলে উহা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিধানাবলী বা রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্যবিধিমালা, ২০০০ সাপেক্ষে প্রযোজ্য হবে মর্মে বিধান রাখা। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন, পৌরসভা আইন, বন আইন প্রভৃতি আইনে উক্ত বিধান সংযোজন করা।

(৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তিকে লঙ্ঘন করে অনেক নির্দেশাবলী জারী করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের স্বার্থে এসব নির্দেশাবলী অচিরেই প্রত্যাহার করা দরকার। নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা গেল-

(ক) ২০০১ সালে জারীকৃত সেনাবাহিনীর 'অপারেশন উত্তরণ' এর নির্দেশাবলী প্রত্যাহার করা।

(খ) সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রাম পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ কর্তৃক ১৯-০৭-১৯৯৮ তারিখে প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের নিকট প্রেরিত পত্র পত্র প্রত্যাহার করা।

(গ) তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকরাও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন মর্মে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০০০ দেয়া অফিস আদেশ প্রত্যাহার করা।

(৭) বিশেষ কার্যাদি বিভাগ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ সম্পূর্ণ বহাল এবং কার্যকর থাকবে মর্মে ২৯/১০/১৯৯০ তারিখ যে স্মারক জারী করা হয়েছে তা বাতিল করা এবং পরিবর্তে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্যবিধিমালা, ২০০০ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ কার্যকর থাকবে মর্মে পুনরায় নতুন বিধান জারী করা।

(৮) বাংলাদেশ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (ইচঅএঈ), বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (ঘউঈ), জুডিসিয়াল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিস প্রশিক্ষণমালায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাসহ আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা: পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থা বরাবরই দেশের অপরাপর সমতল অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা হতে পৃথক। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সংবিধানের আওতায় ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসন কাঠামো প্রবর্তনের বিধান করা হয়েছে। এ শাসন কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধানাবলী অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অঞ্চল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। কিন্তু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব মৌলিক বিষয়গুলোর উপর পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন নির্ভর করে সেসব মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে তৎকালীন সরকার এগিয়ে আসেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের উপর আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের বিধান রয়েছে। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা ও থানা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। তাই আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম কার্যকর করার প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরী।

পার্বত্য জেলা পরিষদ: তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে অধিকতর শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে আরো নতুন ১২টি বিষয়সহ মোট ৩৩টি বিষয় (যাতে ৬৮টি কর্ম রয়েছে) পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু বিধান এখনো সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হয়নি। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি উত্তরকালে কতিপয় প্রতিষ্ঠান ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদে নিকট হস্তান্তর হয়নি। বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), রক্ষিত নয় এমন বন, মাধ্যমিক শিক্ষা, পরিবেশ, সংস্কৃতি, যুব কল্যাণ ও আদিবাসী (উপজাতীয়) প্রথাসহ সকল বিষয় পরিষদের হস্তান্তর করা জরুরী। চুক্তিনামার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রথম তফসিলভুক্ত যাবতীয় কার্যাবলী অর্থাৎ উহাদের সকল কর্ম, প্রতিষ্ঠান, জনবল ও অর্থবল পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সরকার তার পছন্দ-সই লোকদের পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করছে। এসব অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদসমূহের জনগণের কাছে কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই। অচিরেই পরিষদের নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন করে এবং আইন স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা দরকার।

৩.৪. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী: এখনো সশস্ত্রবাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়নি, এমনকি পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয়নি, পক্ষান্তরে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে একপ্রকার সেনা কর্তৃত্ব জারী করা হয়; ভূমি কমিশন গঠিত হলেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু হয়নি এবং ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন প্রণীত হলেও পার্বত্য চুক্তির সাথে ১৯টি বিরোধাত্মক বিষয় সন্নিবেশ করা হয়; ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা হয়নি, পক্ষান্তরে চুক্তিকে লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; সার্কেল চীফের মাধ্যমে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান বিধান কার্যকর করা হয়, তবে চুক্তি লঙ্ঘন করে জেলা প্রশাসককে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়; অস্থানীয়দের নিকট দেয়া ভূমি লীজ বাতিল করা হয়নি, পক্ষান্তরে চুক্তি লঙ্ঘন করে নতুন লীজ প্রদান করা হয়; স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটার তালিকা

প্রণীত হয়নি, পক্ষান্তরে চুক্তি পরবর্তী সময়ে প্রণীত ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; পার্বত্যাঞ্চলের সকল চাকুরীতে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার বিধান কার্যকর হয়নি। এসব বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য অচিরেই পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিবন্ধকতা কাজ করে। রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, সামরিকায়ন, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রধান বাধা হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। নিম্নে এর প্রধান প্রধান দিক উল্লেখ করা গেল-

৪.১. রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে সরকারের বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করলেও চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেই সরকারের মধ্যে একটি প্রভাবশালী কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল নানাভাবে বাঁধা সৃষ্টি করে। ফলে তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৩ বছর ৮ মাস সময় পেলেও চুক্তি বাস্তবায়নে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট গোড়া থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধীতা করে আসছে। ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তারা ঘোষণা দেয় যে, ক্ষমতায় গেলে এই চুক্তি তারা বাতিল করবে। ২০০১ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল না করলেও চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখে। উপরন্তু চুক্তিকে নানাভাবে পদদলিত করে।

অপরদিকে বাম গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে সমর্থন করলেও চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। সভা-সমিতির বক্তব্যে ও কাগজপত্রে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ সমর্থন জানালেও এ যাবৎ তারা কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি।

৪.২. সামরিক কর্তৃত্ব: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অন্যতম বাধা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সামরিক বাহিনীর অদৃশ্যমান প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা। জাতীয় নিরাপত্তা, দেশের অখন্ডতা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অবৈধ সশস্ত্র গ্রুপের তৎপরতা নির্মূলীকরণ ইত্যাদি নানা অজুহাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী নিয়োজিত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনীর মতামত ব্যতীত কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না বলে নানা মহল থেকে অভিযোগ রয়েছে।

বলাবাহুল্য দেশের অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তাও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সংবেদনশীল নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হোক তা তারা চান না। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো 'অপারেশন উত্তরণ' নামে একপ্রকার সেনা কর্তৃত্ব রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরও সেনাবাহিনীর "শান্তকরণ প্রকল্প" নামে কাউন্টার-ইসার্জেন্সী কার্যক্রম বলবৎ রয়েছে।

৪.৩. আমলাতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরেকটি অন্যতম সমস্যা হলো দেশের আমলাতান্ত্রিক বাধা। অধিকাংশ দেশের আমলারা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার ও সংস্কৃতি, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সংবেদনশীল নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিদ্বেষী ও আদিবাসী অধিকার-পরিপন্থী মানসিকতার অধিকারী। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর সহযোগিতা ও সক্রিয় উদ্যোগ দেখা যায় না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও তিন পার্বত্য জেলায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভূমিকাদের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। হাতে গোনা কয়েকজন বাদে অধিকাংশ আমলারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ভূমিকা পালনে লক্ষ্য করা যায়। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকা ও কর্তৃত্বকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে চলে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাও ইতিবাচক নয়।

৪.৪. সাম্প্রদায়িকতা: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আরেকটি অন্যতম বাধা হচ্ছে- মৌলবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক তৎপরতা। মৌলবাদী সংগঠনগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে সেজন্য সেটেলারদের মদদ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করা, পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী-বাঙালী স্থায়ী অধিবাসীদের বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের জীবন-জীবিকার উপর আঘাত হানা, সর্বোপরি ভূমি জবরদখল করে জুম্মদের জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্নকরণের বর্ণবাদী তৎপরতা চালিয়ে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে।

৪.৫. অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা: উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও তিন পার্বত্য সংসদীয় আসন থেকে নির্বাচিত অনেক সাংসদের কার্যকর উদ্যোগ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব, অন্তর্বর্তী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যার-মেম্বারদের দুর্বল নেতৃত্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করে। আত্মমুখী ব্যক্তি স্বার্থ ও সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির কারণে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকটা নির্লীপ্ত থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৫. উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এসব বাধাগুলো অপসারণ করেই চুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গণমুখী ও পরিবশমুখী সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও সর্বোপরি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এখনই উপযুক্ত সময়। তাই সরকারের তরফ থেকে বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ঘোষণা পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

ভূমি সমস্যা ঃ বান্দরবান জেলায় ভূমি লীজ, অধিগ্রহণ, R কবুলিয়ত ও জবরদখলের প্রেক্ষিত

চিংহ্লা মং চাক

বান্দরবান পর্বত্য জেলায় ৭টি উপজেলা, ২৯টি ইউনিয়ন, ২টি পৌরসভা, ৯৫টি মৌজা নিয়ে ১৮ এপ্রিল ১৯৮১ সালে জন্মলাভ করে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠির বসবাস। যার আয়তন ৪,৪৭৯.০৩ বর্গ কিলোমিটার। ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বান্দরবান পার্বত্য জেলা সর্বমোট জনসংখ্যা ৩,০০৭৪০ জন। এর মধ্য আদিবাসী ১,৪১,২১৩ জন ও অ-আদিবাসী ১,৫৯,৫২৭ জন।

১৯৭৮ সালে যাদের বয়স ৮/১০ বছর সে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাজারে পাওয়া মার্বেলের পরিবর্তে রাবার বীজকে মার্বেল হিসেবে ব্যবহার করে খেলা খেলে আনন্দে দিন কাটাত। অন্যদিকে তখনকার সময়ে যুবক ও মুরুব্বীদের কাছ থেকে শুনা যেত এবং প্রাণবন্ত গল্প করতেও দেখা গেছে যে, বান্দরবান পার্বত্য জেলা আদিবাসীরা রাবার বাগানের মালিক হবে। সরকার কোটি কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করবে, এলাকায় শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে, রাস্তাঘাট পাকা হবে, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ আসবে, এলাকায় বেকার যুবক থাকবে না, সকলের কর্মসংস্থান হবে, আদিবাসীদের আর কষ্ট করে জুম চাষ করতে হবে না ইত্যাদি।

এসব গল্প বা আলোচনা কি আদিবাসীদের? আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসক ও আমলাদের মাধ্যমে বান্দরবানে রাজা, হেডম্যান, কার্বারী, জনপ্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজকে ডেকে সব কিছু শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত লোভ-লালসা প্রলোভন দেখাতেন মাত্র। ১৯৭৮ সালে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা রাবার বীজের অপর নাম যে আদিবাসীদের জীবনের বিষ হবে, অভিশপ্ত জীবন হবে তা কোনদিনও ভাবতে পারেনি। ভাবার বিষয়ও নয়। কারণ ৮/১০ বছরে ছোট ছেলেদের তো সে সময়ে তেমন বুদ্ধিমত্তা হয়নি। রাবার বীজ দিয়ে মার্বেল খেলতে পারলেই হলো। সে ছোট ছেলেদের বয়স এখন কারো বয়স ৪০ বছর বা তার অধিক এবং ১৯৭৮ সালে যে সব যুবক মুরুব্বী রাষ্ট্রের লোভ-লালসার গল্পতে মেতে উঠতেন তাদের কারো বয়স ৬০ বছর বা তদউর্ধ্ব বা অনেকে মারা গেছেন। তারাও তো ভাবতে পারেনি বা কল্পনাও করতে পারেনি যে বৃদ্ধ বয়সে ও মৃত্যুকালে নিজ ভূমি থেকে পরবাসী হয়ে কপালে হাত দিতে হবে। কেনই বা ভাবতে পারবে? যেহেতু আদিবাসীরা প্রকৃতির মতো সবকিছুকে সহজভাবে নিতে অভ্যস্ত। এটাই কি তাদের জীবনের জন্য অভিশপ্ত?

১৯৭৮ সালে আদিবাসীরা জুম চাষ করতো, গাছ-বাঁশ ও লাকড়ী আহরণ করতো, রাখালরা গরু-বাছুর চড়াতো, আদিবাসী নারীরা স্বাচ্ছন্দে জঙ্গলের খাদ্য আহরন করতো, মৎস্য শিকার করতো, অবাদে চলাফেরার নিরাপত্তা থাকতো, গভীর বন জঙ্গল ছিল, জঙ্গলে পশু পক্ষী ছিল, জুম চাষের পর নবান্ন উৎসব হতো, জুম ঘরে যুবক যুবতীরা গান গাইত, আজ সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। কেন বা সবকিছু ধ্বংস হবেনা? যেহেতু বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়িসহ চারটি উপজেলায় ১৯৭৮-২০০৯ সালে ২৫০০ জনের অধিক সমতল ভূমির বিভিন্ন এলাকার অধিবাসী যেমন- উচ্চ পর্যায়ের আমলা, প্রভাবশালী ব্যক্তি, বড় টাকাওয়ালা, সাবেক আর্মি অফিসার, সাবেক মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সাংসদ, মন্ত্রনালয়ের সচিব, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশার (ভূমি) প্রমুখরা বা তাদের আত্মীয় স্বজনরা এসব লীজ পেয়ে থাকেন। এসব লীজ প্রাপ্তদের মধ্যে কেউ পার্বত্য অধিবাসীর লোক ছিল না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রথাগত অধিকারকে লঙ্ঘন করে প্রদত্ত লীজের ফলে হাজার জুম্ম অধিবাসী তাদের জুম ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলছে এবং নিজ বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে ম্রো ও ত্রিপুরা আদিবাসী এখন জুমচাষ করতে না পেরে নিজভূমে পরবাসী হয়ে চরম আর্থিক সংকটে মানবেতর জীবন যাপন করছে। বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সমতল জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ) অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১৬০৫টি রাবার প্লট ও হর্টিকালচার প্লট-এর বিপরীতে প্লটপ্রতি পঁচিশ একর করে ৪০,০৭৭ একর জমি ইজারা দেয়া হয়েছে। এই লীজ প্রদানের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। বনের জীববৈচিত্র্য চরমভাবে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এলাকার অধিবাসীদের গো-চারণ ভূমি সংকোচিত হয়ে পড়ছে। এই লীজ প্রদানের ফলে-

১। লীজ প্রাপ্তরা যেমন সমতল ভূমির অধিবাসী ঠিক তেমনি তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু মাত্র লীজ ও ভূমি দখল করা নয়, আদিবাসীদেরকে ধ্বংস করা তাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

২। লীজ প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে সরকার থেকে ২৫.০০ একর লীজ প্রদান করে থাকলেও ২৫.০০ একরের স্থলে লীজ প্রাপ্তদের কারো ৫০ একর বা তদউর্ধ্ব জায়গা দখল করে রেখেছে।

৩। লীজ প্রাপ্তরা শুধু তৃতীয় শ্রেণীর পাহাড় দখল করে নাই। আদিবাসীদের হাজার বছরের ব্যক্তি মালিকানাধীন ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ধানের জমিও কেড়ে নিয়েছে এবং আদিবাসীদের বন্দোবস্তিকৃত ও ভোগদখলে থাকা জায়গা কেড়ে নিয়েছে।

জিয়াউর রহমান সরকার আমলে ১৯৭৯ সাল থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বান্দরবানেও সেটেলার বাঙ্গালী বসতি প্রদান করা হয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় এরূপ সেটেলার বসতি প্রদান করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক তাদের সকলের হাতে আর (R অর্থ Refugee) কবুলিয়ত নামে পদ্ধতি বহির্ভূত দলিল তুলে দেওয়া হয়েছে। R কবুলিয়ত অনুকুলে সেটেলার বাঙ্গালীরা সেখানে বসতি স্থাপন করেছে। সেখানে চৌহদ্দির সাথে কোন মিল নেই। যার যা ইচ্ছা খেয়ালখুশী মতো সেটেলার বাঙ্গালীরা আদিবাসীদের ব্যক্তি মালিকানাধীন পাহাড়, ভোগদখলে থাকা ১ম শ্রেণী জমি জবরদখল করে বসতি স্থাপন করে। যার ফলে লামা আদিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় সেটেলার কর্তৃক আদিবাসীদের জায়গা কেড়ে নেয়া হয়েছে, একটি R কবুলিয়তে যদিও ৫.০০ একর উল্লেখ রয়েছে এবং চৌহদ্দির সাথে মিল নাই বিধায় সেটেলার বাঙ্গালিরা উল্লেখিত একটি কবুলিয়ত বরাতে অনেকে ইচ্ছা মাফিক ৪০/৫০ একর ভূমি জবর দখল করে থাকে।

অন্যদিকে R কবুলিয়ত অনুকুলে জায়গা জবরদখল করে একই কবুলিয়ত প্রদর্শন করে ২০/৩০ জনের নিকট বিক্রি করে বিভিন্ন কায়দায় ভূমি জবরদখল করে থাকে। সেটেলার বাঙ্গালী কর্তৃক এরূপ কত হাজার একর ভূমি বেদখল করে রাখা হয়েছে তা হিসাব করা বড় মুসকিল। সেটেলার বাঙ্গালী কর্তৃক আদিবাসীদের ভূমি জবরদখলের বিরুদ্ধে আদিবাসীরা প্রশাসনের নিকট প্রতিবিধান চেয়েও কোন প্রতিকার লাভ করেনি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তদন্তে আদিবাসীদের জায়গা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও জমি ফেরৎ পায়নি। যার ফলে R কবুলিয়ত আদিবাসীদের ভূমি জবরদখলের সার্টিফিকেটে পরিণত হয়েছে। অনেক সেটেলার বাঙ্গালী বরিশাল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, ফেনীসহ নিজ নিজ এলাকায় চলে গেছে। তারপরও দেখা যায় বরিশাল নোটারি পাবলিক মোকাম আদলত থেকে লামা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি থানার তথা বান্দরবান পার্বত্য এলাকার ভূমিগুলো বিক্রি করে চলেছে R কবুলিয়ত অনুকুলে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় শুধু রাবার ও হর্টিকালচার লীজ নয়, এছাড়াও রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ। সশস্ত্র বাহিনীর গ্যারিসন স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে হাজার হাজার একর জমি সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই অধিগ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী তথা সরকার পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে জুম্ম অধিবাসী নিজ বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং তাদের চিরায়ত জুম ভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

বনবিভাগ একতরফাভাবে বনায়নের নামে ২,১৮,০০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় রয়েছে ৭২,০০০ একর জমি। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সংখ্যালঘু ও সুযোগ বঞ্চিত খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশপরম্পরায় জুমচাষ ও বসতি করে আসা জমিতে পরবাসী হয়ে পড়েছে।

২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠন করেছে।। তারা নির্বাচনী ইসতেহারে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে এবং ১০ মাস সময়ে সরকার তথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কথা ঘোষণা করেছেন। রেডিও, টেলেভিশন ও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে ঢালাওভাবে প্রচার হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবৈধ ভূমি লীজ বাতিল করা হচ্ছে এবং বাতিল করে আদিবাসীদের স্ব স্ব জায়গা ফেরত দেয়া হবে। আসলে কি লীজ বাতিল হচ্ছে? নাকি লীজ বাতিলের নামে পুনরায় আদিবাসীদের ভূমি আরো অধিক জবর দখল করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে?

এসব প্রশ্ন এখন আদিবাসীদের। কারণ বর্তমান সরকার কর্তৃক একদিকে লীজ বাতিলের ঘোষণা অন্যদিকে লামা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি ও বান্দরবান সদর থানা অধীনে যেসব মৌজায় রাবার ও হর্টিকালচার লীজ প্রদান করা হয়েছে সেসব মৌজা আদিবাসীরা লীজ প্রাপ্ত মালিক, ব্যবস্থাপক, ভাড়াটে সন্ত্রাসী ও শ্রমিকদের সাথে ভূমি জবরদখল, আদিবাসীদের গ্রাম, বাগান-বাগিচা উচ্ছেদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত অহেতু তর্কবিতর্ক ঝগড়া বিবাদ, মামলা মোকদ্দমা, প্রশাসনের নিকট আবেদন নিবেদন ও সংঘাত করে যেতে হচ্ছে। অন্যদিকে রাবার মালিকেরা আদিবাসীদের হয়রানি ও সর্বশান্ত করার জন্য চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত করে মিথ্যা মামলা দায়ের করে আদিবাসীদের জীবন জীবিকা অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যে কোন মুর্হুতে বড় ধরনের সংঘাতও হতে পারে। এ জন্য দায়ী কি সরকার নয়? সাম্প্রতিক কালে এই ১০ মাসে দেখা যায় যে পূর্বের তুলনায় রাবার লীজ মালিক ও প্রভাবশালী কর্তৃক ভূমি জবরদখলের প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদিবাসী জনগণ প্রশাসনের নিকট আবেদন নিবেদন করেও কোন প্রকার প্রতিকার পাচ্ছে না। তাহলে আদিবাসী জনগণ কোথায় যাবে?

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর থানাধীন টংকাবতী ইউনিয়নের জনৈক ম্রো আদিবাসীর এক প্রশ্ন- "এই সভ্য যুগে আদিবাসীদের কি পুনরায় আদি মানুষ হতে হবে? আমাদের তো আর জুম চাষের ভূমি নেই, গাছ বাঁশ আহরনের জায়গা নেই, জীবন জীবিকার জায়গা নেই, বসতি গড়ার জায়গা নেই, আদিবাসীরা বংশ পরম্পরায় কোথায় থাকবে? আমাদের কি আদি মানুষের মত গুহায় বসবাস করতে হবে? এটা কি আমাদের পরিণতি?" এই প্রশ্ন শুধু জনৈক ম্রো আদিবাসীর প্রশ্ন নয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সকল আদিবাসীদের একই প্রশ্ন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধন ও ভূমি জরিপ প্রসঙ্গে

ভূমিমন্ত্রী ও পার্বত্য প্রতিমন্ত্রীর বরাবরে জনসংহতি সমিতির চিঠি

অবিলম্বে ভূমি জরিপ বাতিলসহ ৫ দফা দাবীনামা

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন এর চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ শুরু করার সিদ্ধান্ত বাতিল এবং কমিশন কার্যকর করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদারের বরাবরে পত্র প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স এর চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর উশৈ সিং, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সংসদ সদস্য শাহ আলম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন এর অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী-র বরাবরে এই পত্রের অনুলিপি প্রেরণ করেছে।

পত্রে উল্লেখ করা হয়, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ২নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে- "সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।"

'সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক যেখানে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি, আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি, ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের অধিকাংশই এখনো নিজ জায়গা-জমি ফেরৎ পায়নি, সর্বোপরি এখনো ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়নি, সেখানে ভূমি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় কোন উদ্দেশ্যে একতরফাভাবে ভূমি জরিপের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে তা স্পষ্ট নয়। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের এই ঘোষণা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও পদ্ধতি-বহির্ভূত বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।'

'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের মূল কাজ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি জরিপের (ক্যাডেস্ট্রেল সার্ভে) কাজ এই কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত হতে পারে না। কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গিয়ে কেবলমাত্র ক্ষেত্র বিশেষে যে কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত বা কাগজপত্র সরবরাহের এবং প্রয়োজনের উক্ত কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তাকে স্থানীয় তদন্ত, পরিদর্শন বা জরিপের ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারে [কমিশনের আইনের ৬(৩) ধারা]।'

স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক আগে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না করে এবং আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের তাদের জমি প্রত্যর্পন না করে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি ও ভূমি মালিকানা চুড়ান্তকরণের মাধ্যমে পাহাড়ী জনগণের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত না করে কিভাবে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ভূমি মালিকানা ঠিক করা হবে তা বোধগম্য নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী উদ্যোগের ফলে এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধের ক্ষেত্রে আরো একটি জটিল সমস্যার জন্ম দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আশু জরুরী বিষয় হচ্ছে ২০০১ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করা। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। উক্ত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টি বিষয় রয়েছে।'

স্মারকলিপিতে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত ভূমি জরিপসহ ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে গৃহীত অন্যান্য সিদ্ধান্তাবলী অবিলম্বে বাতিল করা।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জাতীয় সংসদের চলিত অধিবেশনে জরুরী ভিত্তিতে সংশোধন করা।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যালয় স্থাপনের জন্য অচিরেই কমিশনের সচিবসহ প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার মধ্য থেকে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগদান করা।

(৪) ভূমি কমিশনের কার্যালয় শক্তিশালী ও সক্রিয় করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োজনমত পরিসম্পদ ও অর্থ বরাদ্দ করা।

(৫) বিধিগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের আনুষ্ঠানিক সভা আহ্বান করা।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকার ১৯ জুলাই ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়োগ প্রদান করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ লাভের পর অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী মহোদয় এখনো ভূমি কমিশন সদস্যদের নিয়ে আনুষ্ঠানিক সভা আহ্বান করেননি। পক্ষান্তরে ভূমি কমিশনের কোন আনুষ্ঠানিক সভার আয়োজন না করে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় সফর করে কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই ভূমি জরিপের ঘোষণা দিয়ে চলেছেন।

উল্লেখ্য যে, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রথমে গত ৩-৫ আগষ্ট ২০০৯ তিন পার্বত্য জেলা সফর করেন এবং বিধিবহির্ভূতভাবে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে চিঠি প্রেরণ করে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সফরকালে কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই একতরফাভাবে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপের ঘোষণা দেন। এরপরে ৭-৮ সেপ্টেম্বর তিনি আবারও যথাক্রমে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি সফর করেন এবং খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসককে কমিশনের সচিব হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁর মাধ্যমে একদিনের নোটিশে আহুত যৌথ সভায় তিনি মতবিনিময় করেন। ভূমি কমিশনের কোন আনুষ্ঠানিক সভার আয়োজন না করে কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ভূমি জরিপের পন্থা-পদ্ধতি ঠিক করা হবে এবং ১৫ অক্টোবর ২০০৯ থেকে শুরু করে আগামী বছরের ১৫ মার্চ ২০১০ এর মধ্যে ভূমি জরিপ সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি ঘোষণা দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রেরিত উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ বাতিল ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে

ঢাকায় বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সাংবাদিক সম্মেলন

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি-জরিপ বাতিল ও শান্তি চুক্তি মোতাবেক ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তির দাবিতে এবং পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জরুরি গুরুত বিষয়ে রাজধানী ঢাকায় সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে পৃথক পৃথকভাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

গত ৭ অক্টোবর ২০০৯ ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটি, ভিআইপি মিলনায়তনে এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিশন (এএলআরডি), আইন ও সালিশ কেন্দ্র, এইচ ডি আর সি, নিজেরা করি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, কাপায়েং ফাউন্ডেশন ও খাগড়াছড়ি হেডম্যান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে 'পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জরুরি গুরুত্ব ও ভূমি জরিপ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক' শিরোনামে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন বিচারপতি মো: গোলাম রব্বানী, সাবেক বিচারপতি, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, খুশী কবির, সমন্বয়কারী, নিজেরা করি, ড: আবুল বারকাত, চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি, সঞ্জীব দ্রং, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, শক্তিপদ ত্রিপুরা, সভাপতি, খাগড়াছড়ি জেলা হেডম্যান এ্যাসোসিয়েশন, সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন, দ্বীপায়ন খীসা, ভাইস চেয়ারপার্সন, কাপেং ফাউন্ডেশন।

সংবাদ বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, 'প্রথমেই আমরা বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ঘোষণা, সরকারের বর্তমান মেয়াদকালেই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ঘোষণা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ,পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা থেকে কিছু অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প ও একটি সেনা বিগ্রেড প্রত্যাহার, পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে নেয়া জমির লীজ বাতিলের সরকারী সিদ্ধান্তকে আন্তরিক অভিনন্দন ও স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা মনে করি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বর্তমান সরকারের ইতিবাচক মনোভাব এবং সদিচ্ছা এ অঞ্চলে শান্তি স্থায়ীকরণে এবং ভূমি বিরোধ উত্তরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।'

এতে আরও উল্লেখ করা হয়, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হিসাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের অন্যতম প্রধান দাবী ছিল একটি স্বাধীন ভূমি কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং সেই দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ প্রণয়ন করেন এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে নিয়োগ দান করেন কিন্তু ঐ কমিশন সম্পদ ও কর্মীর অভাবে কখনই কাজ শুরু করতে পারেনি। বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি বিরোধ সমাধানে কাজ শুরু করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দানের মাধ্যমে । ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান তার প্রথম বক্তৃতায় পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তিতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানোর ঘোষণা দেন, তার এ ঘোষণা সর্ব মহলে প্রসংসিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশন চেয়ারম্যান পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপের ঘোষণা দেন যার মাধ্যমে পার্বত্য বাসীর মনে কিছু উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যতিরেকে ভূমি জরিপের পরিণতি কি হবে সে সম্পর্কেই তাদের উদ্বেগ। কারণ পার্বত্য অঞ্চলে ৩৭ বছরের অস্থির পরিস্থিতির মূল কারণ যে ভূমির মালিকানা বিরোধ তা সমাধান ব্যাতিরেকে যে কোন ভূমি জরিপ পার্বত্য অঞ্চলে পুরনো সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলবে এবং এর মাধ্যমে আদিবাসীরা তাদের শেষ আশ্রয়স্থল এবং অবশিষ্ট জুম ভূমি থেকে উচ্ছেদের শিকার হবেন বলে তাদের ধারণা।'

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, 'আমরা মনে করি, ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান আগামী ১৫ অক্টোবর ২০০৯ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি জরিপের যে ঘোষণা দিয়েছেন তা সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার,পার্বত্য চুক্তির মূল স্পিরিট এবং বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিধানের সঙ্গেও এর কোন সামঞ্জস্য নেই।'

বিবৃতিতে সরকারের কাছে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করা হয়- (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় ভূমি জরিপের যে কোন উদ্যোগ আপাতত স্থগিত করা হোক। (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে জরুরী ভিত্তিতে সংশোধন করা হোক। (৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের ভূমি বিরোধ চিহ্নিত করা এবং এ সংক্রান্ত একটি ডেটাবেইস তৈরী করার উদ্যোগ নেয়া হোক । (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে আঞ্চলিক পরিষদ, সার্কেল চীফ, পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রনালয় এবং সংশিষ্ট অন্যান্য আদিবাসী নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শক্রমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কর্যক্রম গ্রহন করা হোক। (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যালয় স্থাপনের জন্য অচিরেই কমিশনের সচিবসহ প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হোক। (৬) ভূমি কমিশনকে গনতান্ত্রিক রীতি নীতি অনুয়ায়ী সত্যিকার স্বাধীন কমিশন হিসাবে শক্তিশালী করা হোক এবং এটি যেন ব্যক্তি ইচ্ছার কমিশনে রুপান্ত রিত না হয় তা নিশ্চিত করা হোক। (৭) ভূমি কমিশনের কার্যালয় শক্তিশালী ও সক্রিয় করার জন্য প্রয়োজনমত অর্থ বরাদ্দ দেয়া হোক।

বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের সাংবাদিক সম্মেলন

ভূমি জরিপ স্থগিত ও ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের দাবী

গত ১৩ অক্টোবর ২০০৯ একই স্থানে বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলনও একই বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলন এর সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মেসবাহ কামাল।

বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলন এর বিবৃতিতে বলা হয়, 'ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি জরিপের কাজ কিভাবে এবং কোন আইন বা বিধিমালা অনুসারে করবেন তা সুস্পষ্ট নয়। কারণ দেশের সমতল জেলাগুলোতে বিদ্যমান সার্ভে আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য নয়। ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত ১৮৭৫ সালের সার্ভে আইন ও সে সময় শাসন বহির্ভূত এলাকায়ও প্রয়োগ করা হয়নি। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসন বহির্ভূত এলাকার মর্যাদা না থাকলেও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এখনো বলবৎ রয়েছে এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সংবলিত শাসনব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। ১৯৮৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি খতিয়ান অধ্যাদেশ জারি করা হলেও তা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় কার্যকর হতে পারেনি।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'দেশের সমতল অঞ্চলে বন্দোবস্তাধীন নয় এমন সব জমিই কেবল জেলা প্রশাসকের ১ নম্বর খতিয়ান বইয়ে 'খাস' জমি হিসাবে নিবন্ধিত থাকে – যার মালিক রাষ্ট্র। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে এ রকম খাস জমির কোনো অস্তিত্ব নেই। সমতল অঞ্চলে যেসব জমি 'খাস' ধরা হয় সে সব জমি পার্বত্য চট্টগ্রামে হয় ব্যক্তির অধীন ভোগ-দখলীয় জমি নতুবা মৌজাবাসীর সমষ্টিগত মালিকানাধীন জুম ভূমি হিসেবে বিবেচিত। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত এসব আইন, রীতি ও পদ্ধতিগুলো সক্রিয় ও কার্যকর বিবেচনায় নিতে হবে। এ সব আইন, রীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য হয় দেশে প্রচলিত বিদ্যমান সার্ভে আইন সংশোধন করতে হবে, নতুবা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নতুন সার্ভে আইন প্রণয়ণ করতে হবে। এ দাবি জানিয়ে আসছেন পার্বত্যবাসীরা দীর্ঘকাল থেকে। অথচ এসব বিবেচনায় না এনে তড়িঘড়ি করে একতরফা ভূমি জরিপ ঘোষণা স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে আরও জটিলতর করে তুলবে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'দেশের সমতল অঞ্চলে বন্দোবস্তাধীন নয় এমন সব জমিই কেবল জেলা প্রশাসকের ১ নম্বর খতিয়ান বইয়ে 'খাস' জমি হিসাবে নিবন্ধিত থাকে – যার মালিক রাষ্ট্র। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে এ রকম খাস জমির কোনো অস্তিত্ব নেই। সমতল অঞ্চলে যেসব জমি 'খাস' ধরা হয় সে সব জমি পার্বত্য চট্টগ্রামে হয় ব্যক্তির অধীন ভোগ-দখলীয় জমি নতুবা মৌজাবাসীর সমষ্টিগত মালিকানাধীন জুম ভূমি হিসেবে বিবেচিত। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত এসব আইন, রীতি ও পদ্ধতিগুলো সক্রিয় ও কার্যকর বিবেচনায় নিতে হবে। এ সব আইন, রীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য হয় দেশে প্রচলিত বিদ্যমান সার্ভে আইন সংশোধন করতে হবে, নতুবা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নতুন সার্ভে আইন প্রণয়ণ করতে হবে। এ দাবি জানিয়ে আসছেন পার্বত্যবাসীরা দীর্ঘকাল থেকে। অথচ এসব বিবেচনায় না এনে তড়িঘড়ি করে একতরফা ভূমি জরিপ ঘোষণা স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে আরও জটিলতর করে তুলবে।'

বিবৃতিতে একইভাবে, অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলায় ঘোষিত ভূমি জরিপের কাজ স্থগিত করা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে সংশোধন করাসহ ৭ দফা প্রস্তাব পেশ করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের সভা

ভূমি জরিপের ঘোষণা বাতিলের আহবান

গত ১০ অক্টোবর, ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের এক সভায় ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত ভূমি জরিপের কাজ বাতিলের আহবান জানানো হয়েছে। বাবু গৌতম দেওয়ানের সভাপিতত্বে রাঙ্গামাটির সাস মিলনায়লনে অনুষ্ঠিত সভায় এ আহ্বান জানানো হয়।

লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অংশ হিসেবে অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার, কিছু কিছু লীজ বাতিল, লীজ সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্ত এবং চুক্তি বাস্তবায়নের অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন সরকারকে ধন্যবাদ জানায়। আরো বলা হয় যে, উক্ত সভায় ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান কর্তৃক ভূমি জরীপ ঘোষণা, এই অঞ্চলের বন ও ভূমি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এই সভা মনে করে- ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক ভূমি জরীপের ঘোষণা চুক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তাই 'বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন' ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান কর্তৃক ভূমি জরিপ করার ঘোষণা বাতিলের আহবান জানায়। এই সভা কর্তৃক অচিরেই চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ভূমি কমিশনের আইনের ধারাগুলি সংশোধনের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়। এই সভায় অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমি লীজ বাতিল করার দাবী জানানা হয়। সর্বশেষ 'বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন' মহাজোট সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণরূপে এবং দ্রুত বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য উদ্বাত্ত আহবান জানায়।

উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার হেডম্যান, চেয়ারম্যান, নারী নেত্রী, সাংবাদিক ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন পুনর্গঠন ও বাংলাদেশ সফর

গত ১ জুন ২০০৮ ডেনমার্কের কোপেনহেগে অনুষ্ঠিত একসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন পুনর্গঠন করা হয়। উক্ত কমিশন হলো বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরের সংশ্লিষ্ট বিশেজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিশন। এই কমিশনের সদস্যগণ হলেন (ইংরেজী বর্ণমালা ক্রম অনুযায়ী):

(১) ড: স্বপন আদনান, বাংলাদেশ
(২) লর্ড এরিক এভভেরী (সিএইচটি কমিশনে কো-চেয়ার), ভাইস চেয়ার, পার্লামেন্টারী হিউম্যান রাইটস গ্রুপ, যুক্তরাজ্য;
(৩) মি. লারস এন্ডারস বায়ের, প্রেসিডেন্ট অব দি সামি পার্লামেন্ট, সুইডেন;
(৪) মিজ ভিক্টোরিয়া টাউলী করপাজ, চেয়ার, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম, ফিলিপাইন;
(৫) মি. রবার্ট ইভানস্, ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের সদস্য;
(৬) মিজ সারা হোসেন, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ;
(৭) প্রফেসর মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, শাহজালাল ইউনিভার্সিটি, সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী, সিলেট, বাংলাদেশ;
(৮) মিজ এড. সুলতানা কামাল, (সিএইটচি কমিশন, কো-চেয়ার), বাংলাদেশ;
(৯) ড. আইডা নিকোলসান (সিএইটটি কমিশন, কো-চেয়ার), সিনিয়র গবেষক, নর্ডিক ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ, ডেনমার্ক;
(১০) মি. লী সোয়েপ স্ট্রন, মানবাধিকার বিষয়ক প্রাক্তন সিনিয়র এডভাইজার, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও);
(১১) মি. হেডেয়াকি উয়েমুরা, প্রেসিডেন্ট, শিমিন গাইকু সেন্টার, জাপান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন নিম্নলিখিত কর্তব্য পালনের জন্য গঠিত হয়: বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবেশ তৈরী ও উন্নয়ন এবং নাগরিক ও বিচারিক অধিকারের পুন:প্রতিষ্ঠাসহ ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা। বর্তমান কমিশন পূর্ববর্তী প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কর্মকান্ডসহ (১৯৯০-২০০১) তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

উক্ত কমিশন গঠনের পরে তিনবার পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশ সফর করেন। সফর শেষে প্রতিবারই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্ত র্জাতিক কমিশন সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে। কমিশনের উল্লেখিত সফরের তিন সংবাদ সম্মেলনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠকদের অবগতির জন্য পত্রস্থ করা হলো-

(ক) প্রথম সফর

গত ৬-১৪ আগষ্ট ২০০৮ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন প্রথম বাংলাদেশ সফর করেন। সফর শেষে ১৪ আগষ্ট ২০০৮ ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে।

Press Release

On 31 May and 1 June 2008, at a meeting of experts in Copenhagen, Denmark, it was decided to re-establish the Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC) in view of the situation in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh with the following mandate:

> *"To promote respect for human rights, democracy and restoration of civil and judicial rights in the CHT in Bangladesh, including examination of the implementation of the CHT Accord of 1997. The CHT Commission will build on the work by the first CHT Commission. (1990-2001)."*

The Commission has been re-constituted with twelve members from Bangladesh and abroad, and is co-chaired by Lord Eric Avebury, Ms. Sultana Kamal and Dr. Ida Nicolaisen.

The re-constituted Commission held its first visit to Bangladesh from 6th August to 14th August 2008,[1] with the aim of becoming familiar with the situation in the CHT, holding initial meetings with concerned parties and seeking their input into possible actions to be taken and recommendations to be made by the Commission.

During its visit to Dhaka and the CHT, the Commission met a cross-section of society, including government officials, members of the armed forces and local government representatives, political parties, representatives of concerned organisations and affected persons. At meetings with senior leaders of several political parties, the Commission gathered more information on their views on the CHT Accord and their policies for indigenous peoples in the CHT. Civil society representatives in Dhaka and in the CHT shared their concerns regarding lack of implementation of the Accord. High-level officials of the diplomatic community also met with the Commission to listen to their initial impressions on the visits and dialogues held and to exchange views on ways forward.

During its visit to the CHT, the Commission was welcomed by individuals from different communities in the CHT, and received extensive submissions. Uncertainties about land, livelihood and security were constant refrains. There was a common view about the urgent need for peace in the region and for implementation of the Peace Accord, although there were diverse views on the possible means available. The Commission received many reports about ethnic tensions and disharmony, particularly on questions of land occupation and ownership.

The Commission is still at an initial stage of its operations. In the coming months, it will gather and establish a database on information received during and after the first mission. In the light of this evidence, it will then frame recommendations to the Government of Bangladesh and all parties concerned in establishing peace in the CHT. To this end, the Commission takes this opportunity to call for submissions from all concerned persons to its Secretariat by 30th November 2008.

In the meantime, the Commission requests the Government to take steps to ensure that those seeking to communicate with the Commission are able to do so safely and securely. It also asks for early measures to be taken to activate the Land Commission, subject to any necessary amendments, to activate the Refugee Rehabilitation Task Force and also to accelerate dialogue and action for the implementation of the Peace Accord. Finally, it would urge all concerned, in the course of preparation for elections, to emphasise the protection of the civil liberties and democratic rights of all persons throughout the CHT, without discrimination, and with due respect for the protection of rights of disadvantaged communities.

(খ) দ্বিতীয় সফর

পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন ১৬-২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে দ্বিতীয় বার সফর করে। সফর শেষে ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২০০৮ সালে পুনর্গঠিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আজ দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে তার সফর সম্পন্ন করলো। ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণবাস্তবায়নের জন্য সরকার যাতে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে সরকারকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যেই কমিশনের এ সফর অনুষ্ঠিত হয়।

---

[1] Of the twelve Commission Members those undertaking this visit were Lord Eric Avebury and Ms. Sultana Kamal (Co-Chairpersons), Ms. Vicky Tauli Corpuz, Professor. M. Zafar Iqbal, Dr. Shapan Adnan and Ms. Sara Hossain (Members). In addition, resource persons to the Commission including Dr. Meghna Guhathakurta, Ms. Jenneke Arens and Mr. Tom Eskildsen participated in the visit.

সরকারের উচ্চ পর্যায়ের লোকজন যেমন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ, এটর্নী জেনারেল, সেনা প্রধান এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশন সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও কথা বলেছে এবং পার্বত্য এলাকার মানবাধিকার লংঘনের শিকার দরিদ্র লোকজনের সাক্ষাতকারও গ্রহণ করেছে।

সফর শেষে কমিশন জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে প্রাথমিকভাবে কিছু সুপারিশ পেশ করেছে। এসব সুপারিশমালার অন্তর্ভূক্ত হলো- পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিক প্রশাসনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, মানবাধিকার রক্ষা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা, ভূমি কমিশন কার্যকর করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যেসব সেটেলার বাঙালী পরিবার স্বেচ্ছায় সমতল জেলাগুলোতে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তাদের সাহায্য করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কমিশনের চলমান কাজের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা আপনাদের কাছে পেশ করা হবে।

পটভূমি:

গত ৩১মে থেকে ১জুন ২০০৮ ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান অস্থিতিশীল অবস্থার প্রেক্ষিতে নীচে উল্লেখিত লক্ষ্য পরিপূরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন পুণর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

লক্ষ্য: "বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবেশ তৈরী ও উন্নয়ন এবং নাগরিক ও বিচারিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা। বর্তমান কমিশন পূর্ববর্তী প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের (১৯৯০-২০০১) স্থলাভিষিক্ত হবে।" উল্লেখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে পুনর্গঠিত হয়। এর কো-চেয়ারগণ হলেন- লর্ড এরিক এভবেরী (যুক্তরাজ্য), এডভোকেট সুলতানা কামাল (বাংলাদেশ) এবং ড. আইডা নিকোলসন (ডেনমার্ক)।

পুণর্গঠিত কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি সর্ম্পকে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য ২০০৮ সালের ৬-১৪ আগষ্ট সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন করে। এসময় কমিশনের ভবিষ্যত কার্যক্রম ও সম্ভাব্য সুপারিশ সর্ম্পকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ও মানবাধিকার লংঘনের বিভিন্ন অভিযোগও কমিশন সরাসরি গ্রহণ করে।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ১৬-২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন দ্বিতীয়বারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন করে। এ নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগেরর নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণবাস্ত বায়নের অঙ্গীকার করেছিল। এ সফরের লক্ষ্য হলো কমিশনের উদ্বেগ ও মতমত সর্বপ্রথমে নবনির্বাচিত সরকারকে অবহিত করা এবং পার্বত্য চুক্তির পূর্ণবাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও কার্যক্রম যাতে সরকার নির্ধারণ করে সে বিষয়ে অনুরোধ জানানো। এর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা জরুরী ভিত্তিতে বন্ধের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দাওয়া।

কমিশন সদস্যগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং নবনিযুক্ত অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের সাথে আলোচনা করেছেন। মন্ত্রীপরিষদের যেসব সদস্যের সাথে কমিশনের আলোচনা হয়েছে তাঁরা হলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী; খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী; শিল্প মন্ত্রী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী। এছাড়া রয়েছেন সেনা প্রধান, এটর্নী জেনারেল, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, রাজনৈতিক দল, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবর্গ (সাংবাদিক, আইনজীবি ও শিক্ষাবিদসহ)। কমিশনের সদস্যগণ খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায় মাঠ পর্যায়েও পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন এবং পাহাড়ি ও বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলেছেন। তাঁরা জোরপূর্বক জমি দখল ও মানবাধিকার লংঘনের শিকার সাধারণ জনমানুষের বক্তব্যও শুনেছেন।

সুপারিশসমূহ:

বেসামরিক প্রশাসনের ক্ষমতা বাড়ানো

সরকারের বক্তব্যের সাথে কমিশনও একমত যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি মূলত: রাজনৈতিক সমস্যা এবং সামরিক নয় বরং রাজনৈতিকভাবেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিছু ব্যতিক্রম বাদে সিভিল প্রশাসনের যেসব কার্যক্রম এখন সামরিক বাহিনী কর্তৃক সম্পাদন করা হচ্ছে (যার জন্যে সামরিক দক্ষতার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই) যেমন, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, পুনর্বাসন প্রকল্প ইত্যাদি সেগুলো অনতিবিলম্বে বেসামরিক প্রশাসন এবং পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ 'অপারেশন উত্তরণ' এর পরিধি ও ব্যাপকতার ব্যাপারে কমিশন উদ্বিগ্ন। সামরিক বাহিনীর এ চলমান অপারেশন সর্ম্পকে দেশের সাধারণ মানুষ অবগত নন। জানা যায় যে, যে নির্বাহী আদেশবলে এ অপারেশন চালু করা হয়েছে তাতে

যথাযথ আওতার বাইরেও সামরিক বাহিনী বেসামরিক প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। সেকারণে আমরা সরকারকে এ নির্বাহী আদেশ জনসমক্ষে তুলে ধরার আহবান জানাই যাতে জনস্বার্থে এ নির্বাহী আদেশটি পর্যালোচনার সুযোগ পাওয়া যায়।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক বাহিনীর সংখ্যা সামান্য কমানো হলেও এখন আর তা দেখা যাচ্ছেনা । কমিশন দেখতে চায় যে, একটি যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যে পার্বত্য চুক্তিতে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার সম্পন্ন করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন নবনির্বাচিত সরকারের দেয়া দায়মুক্তির সংস্কৃতি বাতিলের প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন জানায়। সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা তদন্তেও যাতে সরকারের এই নীতি বজায় থাকে এবং মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলো নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে পর্যাপ্ত প্রমানাদি পাওয়া গেলে মানবাধিকার লংঘনকারীদের যাতে বিচার করা হয় তা সরকার সুনিশ্চিত করবে বলে কমিশন আশা করে।

মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগঃ

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। সেকারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল কার্যকর করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে। সরকারী পর্যায়ের আইন সহায়তা কার্যক্রম চালু করাসহ তথ্য প্রাপ্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক শিক্ষার উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে যাতে মানবাধিকার লংঘন ও অন্যান্য অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গ ও স্বাক্ষীগণ, বিশেষ করে নারীরা, ন্যায়বিচার পেতে পারেন। সরকার ঘোষণা করেছে যে, বিতর্কিত মামলাগুলো পর্যালোচনা করা হবে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব মামলা একটি নিরপেক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পর্যালোচনা করার এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যাতে যথাযথ সুবিচার পায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারের কাছে আহবান জানাচ্ছি।

সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ :

সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আদিবাসী জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোতে যাতে তাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত হয় সেজন্যে কার্যকর ব্যবস্থা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে যত দ্রুত সম্ভব পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর নির্বাচন সম্পন্ন করার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। ভূমি বিষয়ে উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাদি নিষ্পন্ন হওয়ার পরপরই জেলা পরিষদগুলোর নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। ইতিমধ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলো আদিবাসী প্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার প্রতিনিধিকে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

আইন ও চুক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানগুলি কতটা সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

ভূমি কমিশন

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি কেন্দ্রিক বহু সমস্যা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। যেমন:- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের নামে বরাদ্দ দেয়া জমির মালিকানা রেকর্ডভূক্ত না করা, পাহাড়ী উদ্বাস্তু- যাদের অভিবাসন ও পুর্ণবাসনের কথা ছিল তা না করা, পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষদের জোর পূর্বক ভূমি থেকে উচ্ছেদ, অপ্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে অবৈধভাবে ভূমি দখলকে বাতিল না করা। পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুযায়ী ভূমি কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে এই সব ভূমি বিরোধের নিষ্পত্তি করা এবং ভূমি কমিশনের সক্রিয় অস্তিত্ব পার্বত্য চুক্তির অন্যান্য দিকগুলির বাস্তবায়নের একটি পূর্ব শর্তও বটে; যেমন- ভূমি জরিপ এবং ভূমি মালিকানার রেকর্ড হালনাগাদ করা এবং পাহাড়ী জেলা পরিষদসমূহের ভোটার তালিকা সার্বিভাবে প্রস্তুত করার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। আর এর সবই গোটা অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান যোগাবে।

বাংলাদেশ সরকারের উচিত অবিলম্বে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে যথাযথভাবে সক্রিয় করা এবং তাকে সকল প্রয়োজনীয় সুবিধা ও উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা যাতে সে বিরোধ নিষ্পত্তি করে সুবিচার কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যেমনটি ১৯৯৭ সালের চুক্তিতে বলা হয়েছে।

সরকার তিনটি পার্বত্য জেলার একটি করে উপজেলাকে সামনে রেখে অবিলম্বে স্বাধীন-নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ টীমকে দিয়ে সমীক্ষা চালাতে পারেন- যার মাধ্যমে ভূমি মালিকানা বিরোধের ধরণ ও ব্যাপকতা নিরূপণ এবং সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য কি ধরণের লজিস্টিক ও মানবিক শক্তি সমাহার প্রয়োজন এবং পূর্ণ উদ্যমে কাজটি সুসম্পন্ন করতে করতে হবে তা বোঝা যায়।

স্বেচ্ছায় সেটলার বাঙ্গালীদের সমতল ভূমিতে স্থানান্তর

পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্যদের মাঠ পরিদর্শনের সময় অনেক বাঙ্গালী সেটলার বলেছেন যে তারা সেখানকার বিদ্যমান কষ্টকর ও করুণ পরিস্থিতির বদলে ঐ এলাকার বাইরে সমতলের জেলাগুলিতে, সুযোগ দিলে, গিয়ে বসবাস করতে আগ্রহী, বিশেষ করে যদি এ ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেন। সেটলার বাঙ্গালীদের একটি অংশও যদি স্বেচ্ছায় অন্যত্র চলে যায় তাহলে একই সঙ্গে তার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস পাবে, পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর লোকদের যে সব ভূমিতে তারা ছিলেন তা খালি হবে- এবং সার্বিভাবে তা ঐ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন তাই সরকারের কাছে এই মর্মে অনুরোধ জানায় যে, তারা যেন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেটলার বাঙ্গালীদের স্বেচ্ছায় সমতলের জেলায় স্থানান্তরের এই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে একটি কার্যকর প্রক্রিয়া এখনই শুরু করেন। এর ফলে সেটলার বাঙ্গালীদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে তাদের কার্যকর পুনর্বাসন ত্বরান্বিত করা যাবে। এটা কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রনোদনা এবং নিরুৎসাহিত করণের পদক্ষেপের সম্মিলন ঘটানো যেতে পারে। যে পরিসরে সেটলার বাঙ্গালীরা এই প্রস্তাব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন- তাকেই পরীক্ষামূলক ব পাইলট কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করে উপরে উল্লেখিত ৩টি উপজেলার পরীক্ষামূলক জরিপ চালানো যেতে পারে।

যে সেটলার বাঙ্গালী স্বেচ্ছায় স্থানান্তরের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে নতুন স্থানান্তরের এলাকায় ৩ বছরের জন্য বিনামূল্যে পারিবারিক রেশন প্রদান করা যেতে পারে। একই সাথে কিছু নগদ টাকা, কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা- ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং স্থানান্তরের সময় বিনা খরচায় পরিবহন সুবিধা দেয়া যেতে পারে। এই সহায়তার আশ্বাস শুরুতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য- যেমন প্রথমে ১ বছরের জন্য দেয়া, পরে তা সম্প্রসারিত করা। এরই পাশাপাশি পার্বত্য জেলাগুলিতে সেটলার বাঙ্গালীদের বিনামূল্যে যে রেশন দেয়া হতো তাও নোটিশ-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়ার পর পর্যায়ক্রমে (১ থেকে ২ বছরের মধ্যে) বন্ধ করার প্রক্রিয়াও শুরু করা যেতে পারে। সেটলার বাঙ্গালী যারা সেখানে আছেন কিংবা নতুন করে প্রবেশ করছেন তাদের কারোর জন্যই নতুন কোন সুবিধা বা বস্তুগত কোন সাহায্য সরকারের আর দেওয়া ঠিক হবে না। আর যারা স্বেচ্ছায় স্থানান্তরের এই প্রস্তাব গ্রহণ না করবেন এবং পার্বত্য জেলায় থেকে যাবেন তাদের জন্য বিদ্যমান সুযোগগুলিও ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন। পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষদের কাছ থেকে অবৈধভাবে নিয়ে নেওয়া ভুমি যদি ভূমি কমিশন তাদের প্রত্যর্পণ করে তা হলে সেটাও স্বেচ্ছায় বাঙ্গালী সেটলারদের স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত ও শক্তি যোগাবে। এর ফলে উভয়ের পুণর্বাসনের প্রক্রিয়াও জোরদার হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নির্দিষ্ট বর্তমান প্রতি মন্ত্রীর পদটি পনর্বিবেচনা করা এবং একজন পূর্ণ মর্যাদার মন্ত্রী এই মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, তারা যেন আন্তর্জাতিক সনদ, কনভেনশন ও চুক্তিগুলো জনস্বার্থে পুরাপুরি বাস্তবায়ন করেন এবং যে সকল চুক্তির কোন ধারার ব্যাপারে ভিন্নমত আছে তাও পুণর্বিবেচনা করেন:- চুক্তি ও কনভেনশনগুলো হচ্ছে- আইসিসিপিআর, আইসিইএসসিআর, সিইআরডি, সিডও, সিএটি এবং সিআরসি।

(গ) তৃতীয় সফর

পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন গত ১১-১৬ আগস্ট ২০০৯ তারিখ তৃতীয় বার সফর করে। সফর শেষে ১৮ আগস্ট ২০০৯, বিকাল ৩:০০ টা সংবাদ সম্মেলন করে।

প্রেস বিবৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ১২ বছর পর চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে দেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন সন্তোষ প্রকাশ করছে। এসব সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন, ভূমি কমিশন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্সের পুনর্গঠন, বনায়নের নামে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা জমির লীজ বাতিল এবং অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার। এসব পদক্ষেপ পার্বত্য চুক্তি বাস্ত বায়নের পক্ষে একটি প্রত্যাশাব্যঞ্জক গতিময়তার সৃষ্টি করেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মনে করে এসব শুভ উদ্যোগ সত্যিই উৎসাহযোগ্য ও প্রশংসার দাবীদার। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়। তাঁর এ বক্তব্য শুধুমাত্র বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য নয়, বরং সারা বিশ্বের আদিবাসীদের জন্যও উৎসাহব্যঞ্জক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্যবৃন্দ[২] গত ১১-১৬ আগস্ট ২০০৯ তারিখের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার সবকটি পরিদর্শন করে এসেছেন। সেখানে তাঁরা সরকারী প্রতিনিধি, সেনাবাহিনীর তিনটি ব্রিগেডের কমান্ডার এবং তাঁদের জোন কমান্ডারবৃন্দ, উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনীতিবিদ এবং পাহাড়ি ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসহ সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেছেন। ব্রিগেড কমান্ডার এবং তাদের স্টাফদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্যবৃন্দকে জানানো হয় যে, সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের জন্য সরকারের যে নীতি তা বাস্তবায়িত হলে তাঁরা সেখানে কোন নিরাপত্তাজনিত হুমকি দেখেন না। পুলিশ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষও এই অভিমতকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন।

সব দলের সাথে আলোচনার সময় ভূমি সমস্যার ইস্যুটি উদ্বেগের প্রধান বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। সে কারনে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মনে করে যে, এ মুহূর্তে ভূমি কমিশনকে পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা ও তার অর্থায়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। এটি ভূমি বিরোধগুলো নিষ্পত্তির জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল হিসেবেও কাজ করবে যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভের (জরীপ) কাজ হাতে নেয়ার আগে সকল ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ভূমি কমিশনকে কার্যকর করার ধীরগতি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। একইভাবে বিরোধপূর্ণ জমিগুলোর মালিকানা চিহ্নিতকরণে ভূমি কমিশনের কাজের কোন অগ্রগতি না হওয়া, ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হওয়ার আগে ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে শুরু করার আপাতঃ সিদ্ধান্ত এবং পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কোন প্রস্তাব বা উদ্যোগ না দেখেও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন অসন্তুষ্ট।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আশা করে যে, ভূমি কমিশন বিরোধপূর্ণ সকল ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত দাবী দাওয়ার একটি ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা করবে এবং ভূমির দাবীদারদের হাতে ফরম তুলে দেবে যাতে তারা প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সেখানে লিখে ভূমি কমিশনকে সরবরাহ করতে পারে। এক্ষেত্রে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তার জন্য এটি ইউএনডিপি'র মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মুখাপেক্ষী হওয়ার একটি বিষয় হতে পারে। যেহেতু বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একই ভূমির উপর একাধিক ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দেয়ার কারনে উপর্যুপরী মালিকানার জটিলতা রয়েছে, সেকারণে ভূমি কমিশনের উচিত হবে বিভিন্ন ধরনের ভূমি মালিকানার আপেক্ষিক অগ্রাধিকার নির্ধারনের জন্য কিছু সুনিশ্চিত/সুসংগত নিয়মাবলী প্রনয়ন করা। এক্ষেত্রে যাদের ভূমি মালিকানার দাবী গ্রাহ্য হবেনা তাঁদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থার একটি খসড়া সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য সরকারের প্রস্তুত করা উচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের শরণার্থীদের পুর্নবাসন বিষয়ক টাস্কফোর্সকে কার্যকর করা এবং এর যথাযথ অর্থায়ন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনকে সর্তক করা হয়েছে। এছাড়াও টাস্কফোর্স এবং ভূমি কমিশনের মধ্যে কাজের বিভাজন ও পারস্পরিক সমন্বয়ের জন্য জরুরী ভিত্তিতে সরকারী দিক নির্দেশনা প্রনয়ন করা জরুরী।

আইনী সহায়তা বিষয়ক কমিটিগুলো কার্যকর করা সহ পার্বত্য অঞ্চলে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরও ব্যাপকভাবে চালু করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আবারও আহবান জানাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়ার বিষয়টি খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন সুপারিশ করছে যে, এই নির্বাচনগুলোর জন্য অবিলম্বে বিকল্প নির্বাচনী পদ্ধতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন বাঙালি ও পাহাড়ি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া নথিপত্র সহ ব্যাপক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে যেগুলো যথাযথভাবে বিশ্লেষন ও পর্যালোচনা করা হবে এবং এসব তথ্যাদি ব্যবহার করে এবারের সফরের একটি প্রতিবেদন যথারীতি প্রস্তুত করা হবে। আগামী বছরের জন্যও আরেকটি আন্তর্জাতিক সফর পরিচালনার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যাপক ও অধিকাংশ জনগণ ঐ অঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলোর সাথে তাঁরা সকলেই সহযোগিতা করবেন। শান্তি একটি অপরিহার্য মানবাধিকার। সরকার এবং জনগণ উভয়ের সকল প্রচেষ্টা এই শান্তি অর্জনের জন্য উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত।

---

[২] কমিশনের ১১ সদস্যের মধ্যে যাঁরা তৃতীয়বারের সফরে অংশগ্রহন করেছেন তাঁরা হলেন: লর্ড এরিক এভভেরী, ড. আইডা নিকোলসন এবং এড. সুলতানা কামাল(তিনজনই কো-চেয়ারপার্সন); মি. লারস এন্ডারস বায়ের, মি. হেডেয়াকি উয়েমুরা, ড. স্বপন আদনান এবং মিজ সারা হোসেন (সকলেই সদস্য)। এছাড়াও রয়েছেন- ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, মিজ জেনেকি এরেনস এবং মি. টম এসকিলডসেন (সবাই কমিশনের এডভাইজার)। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সচিবালয় থেকে অংশ নিয়েছেন মিজ ক্রিস্টিনা নিলসন এবং মিজ্ হান্না শামস আহমেদ।

রাজস্থলীতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীর গুলিতে নিরীহ গ্রামবাসী নিহত

১১ জানুয়ারী ২০০৯ মধ্যরাতে ইউপিডিএফ-র সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী উপজেলাধীন গাইন্দার ক্রংচাগোই পাড়ার ধুনচা প্রু মারমা (৩৮) নামের এক নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে। জানা যায়, ঐ দিন মধ্যরাতে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সদস্যরা ধুনচা প্রু মারমার বাড়ী ঘেরাও করে এবং তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের পরপরই গ্রামের পাশ্ববর্তী এলাকায় ধুনচা প্রু মারমাকে গুলি কবে হত্যা করা হয়।

লংগদুতে জুম্ম ও সেটেলার বাঙালী সংঘর্ষ

১৫ জানুয়ারী ২০০৯ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন বগাচদর এলাকায় স্থানীয় জুম্ম ও সেটেলার বাঙালীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ঐ ঘটনার পরবর্তী লংগদু উপজেলার পার্শ্ববর্তী বরকল উপজেলাধীন সুবলং বাজারে পার্শ্ববর্তী সেটেলার বাঙালীরা স্থানীয় জুম্ম জনসাধারণের উপর হামলা চালায়।

জানা যায় যে, সেটেলার বাঙালীরা কয়েকদিন ধরে জুম্মদের মালিকানাধীন এলাকায় গিয়ে বনজদ্রব্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিল। অপরদিকে, জুম্মরা তাদের বাগান-বাগিচা থেকে গাছ ও বাঁশ সংগ্রহে সেটেলারদের নিষেধ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বাঙালী সেটেলাররা জুম্মদের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে অব্যাহতভাবে গাছ-বাঁশ সংগ্রহ করতে থাকে। ঐ দিনও বাঙালী সেটেলাররা গাছ-বাঁশ সংগ্রহ করতে জুম্মদের এলাকায় যায়। ফলে জুম্মরা সেটেলার বাঙালীদের বাঁধা দেয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঐ ঘটনার জের ধরে সেটেলার বাঙালীরা বরুণাছড়ি বাজার আসা জুম্ম জনসাধারণের উপর হামলা চালায়। সেটেলারদের ঐ হামলায় অনেক জুম্ম গ্রামবাসী আহত হয় বলে জানা যায়। এতে ধারালো দায়ে মারাত্মকভাবে আহত দুই জুম্মকে লংগদুর আল-রাবেতা হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়। অপরদিকে এই ঘটনায় আহত ৮ বাঙালী সেটেলারকেও ঐ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

দীঘিনালায় পুলিশ কর্তৃক প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য গ্রেফতার

১৫ জানুয়ারী ২০০৯ সকালে দীঘিনালার পুলিশ জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য জকোজ চাকমাকে গ্রেফতার করে। জানা যায়, পুলিশি হেফাজতে থাকার সময় জকোজ চাকমাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। মারাত্মক আঘাতের কারণে আদালতে নেয়ার পরিবর্তে তাকে খাগড়াছড়ি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঢাকায় পুলিশ কর্তৃক জনসংহতি সমিতি নেতা শক্তিপদ ত্রিপুরা গ্রেফতার

২২ জানুয়ারী ২০০৯ মধ্যরাতে ঢাকার মিরপুরে ভাড়ায় থাকা বাসা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, শক্তিপদ ত্রিপুরা হেডম্যান সমিতির একজন নেতা এবং সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান।

জানা যায়, রাত প্রায় ১১:৩০ টায় মিরপুর থানা থেকে আগত পুলিশের একটি দল মিরপুরস্থ শক্তিপদ ত্রিপুরার বাসায় গিয়ে তল্লাশী চালায়, যে বাসায় শক্তিপদ ত্রিপুরা ২০০৭ সাল হতে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বসবাস করে আসছেন। পুলিশ বাড়ীতে তল্লাশী চালিয়ে কাপড়-চোপর ও মূল্যবান জিনিসপত্র ওলটপালট করে দেয়। এরপর বাসা থেকেই শক্তিপদ ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে গ্রেফতারের সময় পুলিশ শক্তিপদ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রদর্শন করতে পারেনি। হাবিলদার শাহজাহান শক্তিপদ ত্রিপুরার স্ত্রী বাসন্তী ত্রিপুরাকে বলে যে, রাত্রে তার স্বামীকে খোঁজ না নিতে; তবে, পরবর্তী দিন ভোর সকালে মিরপুর থানায় যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। পরদিন সকাল ৮:০০ টায় বাসন্তী ত্রিপুরা তার ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মিরপুর থানায় তার স্বামীর সাথে দেখা করতে যান। তবে, মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহিউদ্দিন ভূল তথ্য দেন যে, শক্তিপদ ত্রিপুরাকে সেখানে নিয়ে আনা হয়নি। এরপর আবার এ্যাডভোকেট হেমন্ত ত্রিপুরা মিরপুর থানায় যান এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ্যাডভোকেট হেমন্তর সাথে দুর্ব্যবহার করেন। অবশেষে এ্যাডভোকেট হেমন্ত তার আইনজীবির পরিচয় পত্র দেখালে, থানায় শক্তিপদ ত্রিপুরার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ও লেখক সঞ্জীব দ্রং মিরপুর থানায় শক্তিপদ ত্রিপুরার সাথে দেখা করতে গেলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার সাথেও খারাপ ব্যবহার করেন। এরপর দুপুর ২:০০ টায় শক্তিপদ ত্রিপুরাকে ঢাকা চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফেরদৌস আরা আদালতে হাজির করা হয়। শক্তিপদ ত্রিপুরার পক্ষে এ্যাডভোকেট

প্রকাশ রঞ্জন বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট মুহিবুর রহমান মিহির, এ্যাডভোকেট মনিরা আকতার ও এ্যাডভোকেট হেমন্ত ত্রিপুরা জামিনের আবেদন করেন। কিন্তু মিসেস আরা জামিনের আবেদন নাকচ করে শক্তিপদ ত্রিপুরাকে জেলে প্রেরণ করেন।

উল্লেখ্য যে, জরুরী অবস্থা চলাকালে ২০০৭ সালের ১৪ জুন আর্মির নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী খাগড়াছড়ি জেলা সদরের খাগড়াপুরে শক্তিপদ ত্রিপুরার বাসায় তল্লাশী চালায়। ঐ সময় শক্তিপদ ত্রিপুরা বাসায় অনুপস্থিত ছিলেন। তবে, সেনা বাহিনী তাঁর বাসা থেকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার অর্থ সম্পাদক ভোলাশ ত্রিপুরাকে তুলে নিয়ে যায় এবং পরে শক্তিপদ ত্রিপুরা ও ভোলাশ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র ও বৈদেশিক মূদ্রা রাখার বানোয়াট অভিযোগে খাগড়াছড়ি থানায় দু'টি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। সেনা সদস্যরা শক্তিপদ ত্রিপুরার পাসপোর্টও জব্দ করে। জানা যায়, শক্তিপদ ত্রিপুরা যখনই মামলা আইনগতভাবে লড়াই করার জন্য খাগড়াছড়ি আসার চেষ্টা করছিলেন তখনই তিনি গ্রেফতার হন।

রোয়াংছড়িতে নির্বাচনের জের হিসেবে ৮ জুম্ম গ্রামবাসী অপহৃত

উপজেলা নির্বাচনের পরপরই ২৩ জানুয়ারী ২০০৯ ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আরাকান (ডিপিএ) এর একটি সশস্ত্র দল কর্তৃক রোয়াংছড়ি উপজেলায় ক্যবা মারমার সমর্থক ৮ জুম্ম গ্রামবাসীকে অপহরণ করা হয়। এই অপহরণের প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখা ঐ দিন এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন যে, মূলতঃ ক্যবা মারমাকে সমর্থনকারী গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে পাল্টা জবাব দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ঘটনা ঘটাতে বীর বাহাদুর প্রত্যক্ষভাবে ডিপিএকে উস্কানী দেয়, যাতে বেতছড়ি ভোট কেন্দ্রে ভোট পূণগণনার জন্য এবং দয়াল চন্দ্র পাড়া ভোট কেন্দ্রে পূণনির্বাচনের জন্য তারা নির্বাচন কমিশনে যেতে না পারেন।

জানা যায়, মধ্যরাতে ডিপিএ-র একটি সশস্ত্র দল প্রথমে ক্যবা মারমার বাবার বাড়ী ঘেরাও করে। তবে ঐ সময় তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। তারপর ডিপিএ-র সশস্ত্র দলটি নিম্নোক্ত গ্রামবাসীদের তাদের বাসা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়ঃ

(১) উচান্যু মারমা (৩৮) পীং- শৈয়েহ্লোও মারমা, গ্রাম- অংজাই পাড়া (তিনি অংজাই পাড়া রেজিস্টার প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক);

(২) থোয়াইচামং কার্বারী (৪২) পীং- মৃত ক্য অং মারমা, গ্রাম- বেঙছড়ি নতুন পাড়া;

(৩) মং থোয়াও চিং মারমা (৫৫) পীং- মৃত ক্রাইমং কার্বারী, গ্রাম- বেঙছড়ি (তিনি একজন ভিডিপি সদস্য);

(৪) উহাই মং মারমা (৩০) পীং- আনতাহা মারমা, গ্রাম- বেঙছড়ি;

(৫) অংক্যাচিং মারমা (২৮) পীং- রুইয়ু মারমা, গ্রাম- বেঙছড়ি;

(৬) লরেন ত্রিপুরা (৩৫) পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- সাধু হেডম্যান পাড়া;

(৭) পুলিচান ত্রিপুরা (৩০) পীং- শরৎ চন্দ্র কার্বারী, গ্রাম- শরৎ চন্দ্র কার্বারী পাড়া;

(৮) শান্তিলাল ত্রিপুরা (৫৫) পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- সাধু হেডম্যান পাড়া।

অবশেষে রাংলাই ম্রো মুক্ত

দীর্ঘ প্রায় ২ বছর কারাভোগের পর অবশেষে জামিনে মুক্তি পেলেন মানবাধিকার কর্মী রাংলাই ম্রো। উচ্চ আদালত কর্তৃক জামিন মঞ্জুর করার ১৯ দিন পর গত ২৬ জানুয়ারী ২০০৯ তিনি মুক্তি পান। ইতোমধ্যে তিনি ছিলেন ঢাকার ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব কারডিও ভাসকুলার ডিজিসেস (এন আই সি ভি ডি) এর বেডে হাতকড়া পড়া অবস্থায় এবং জেল কর্তৃপক্ষের কাছে উচ্চ আদালতের জামিনের আদেশ পৌঁছুতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি আরও অতিরিক্ত ১৯ দিন বন্দী জীবন কাটাতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ এই দিন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী রাংলাই ম্রোকে দেখতে যান, তার খোঁজ খবর নেন এবং কর্তৃপক্ষের সাথে তার মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করেন। এর পরপরই রাংলাই ম্রো মুক্তি পান। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী আদিবাসী নেতা রাংলাই ম্রো যৌথ বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হন।

রাঙ্গামাটিতে সন্তু লারমার বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের

২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সকাল ৯:৫০ টায় রাঙ্গামাটি শহরের চম্পকনগর এলাকায় নিজের বাড়ীর পার্শ্ববর্তী এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক চন্দ্র শেখর চাকমা। বুকের ডান দিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে

আহত অবস্থায় চন্দ্র শেখরকে প্রথমে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে চট্টগ্রামে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এই দিনই এই ঘটনার ব্যাপারে চন্দ্র শেখর চাকমা রাঙ্গামাটি জেলার কোতয়ালী থানায় অপরিচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নং- ০৪, তারিখ ২৫/০২/২০০৯, ধারা ৩২৬/৩০৭/৩৪ বিপিসি। মামলায় মিথ্যাভাবে ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) সহ ১৫ জন জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতাকে জড়িত করা হয়। জানা যায়, গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার পরপরই চন্দ্র শেখর চাকমাকে যখন রাঙ্গামাটি হাসপাতালে নেওয়া হয় সেখানে সাদা কাগজে তার দস্তখত নেওয়া হয়। পরে ঐ সাদা কাগজে এ্যাডভোকেট শক্তিমান চাকমা মামলার এজাহার লেখেন এবং তাতে সন্তু লারমাসহ অন্যান্য নেতাদের জড়িত করেন। মামলায় গুলি বর্ষণকারীকে চন্দ্র শেখর চাকমা চেহারায় চিনেছিল বলে উল্লেখ করা হয় এবং সন্তু লারমা ও উষাতন তালুকদারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা, সংশ্লিষ্টতা ও পরিকল্পনায় হামলা সংঘটিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়। মামলায় নিম্নোক্ত নেতৃবৃন্দকে জড়িত করা হয়ঃ

১) জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) পীং- প্রয়াত চিত্ত কিশোর চাকমা, কল্যাণপুর;
২) উষাতন তালুকদার (৫২) পীং- অজিত কুমার তালুকদার, কলেজ গেইট;
৩) মৃগাঙ্ক কুমার খীসা (৩৮) পীং- পূর্ণাঙ্গ বরণ খীসা, ট্রাইবেল আদাম;
৪) বোধিসত্ব চাকমা (৩৭) পীং- সন্তোষ চাকমা, কাটাপাহাড়;
৫) অংকুর চাকমা (৩৫) পীং- অজ্ঞাত, রাঙ্গাপানি;
৬) টন্টুমনি চাকমা (৩২) পীং- অজ্ঞাত, বনরূপা;
৭) ধীরাজ চাকমা (৩০), পীং- সুনীতি কুমার চাকমা, কল্যাণপুর;
৮) শুভজ্যোতি চাকমা (৩০) পীং- অজ্ঞাত, টিএন্ডটি এলাকা;
৯) পহেল চাকমা (২৩) পীং- অজ্ঞাত, ফিশারী পাড়া;
১০) অধিরাম চাকমা (২৬) পীং- অজ্ঞাত, রাঙ্গাপানি;
১১) তুহিন চাকমা (২৬) পীং- প্রবীর চন্দ্র চাকমা, বিহারপুর;
১২) শোভন চাকমা (২৮) পীং- অজ্ঞাত, সিও অফিস এলাকা;
১৩) যুবন বিকাশ চাকমা (৩০) পীং- অজ্ঞাত, চক্রপাড়া;
১৪) ফরেন চাকমা (৩০) পীং- অজ্ঞাত, চক্রপাড়া;
১৫) সুবর্ণ চাকমা (৫০) পীং- মৃত অমৃত লাল চাকমা।

সাধনাটিলা বিহারের ভোজনশালায় সেনাসদস্যদের জুতা পায়ে প্রবেশ

৭ মার্চ ২০০৯ একদল সেনাসদস্য ধর্মীয় রীতিকে লংঘন করে সাধনাটিলা বুদ্ধ বিহারের ভোজনশালায় জুতা পায়ে প্রবেশ করে এবং বিহারের প্রধান ধর্মীয় গুরু বুদ্ধ বংশ ভিক্ষুকে অপমান করে। এসময় বুদ্ধ বংশ ভিক্ষু ও অন্যান্য ভিক্ষুগণ সিয়ং (ভোজন) গ্রহণ করছিলেন।

দীঘিনালায় সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্মর মৃতদেহ বহনকারী এ্যাম্বুলেন্স চার ঘন্টা আটক

১২ মার্চ ২০০৯ সেনাবাহিনী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালায় জনৈক জুম্মর মৃতদেহ বহনকারী এ্যাম্বুলেন্সটি হয়রানিমূলকভাবে এক চেকপোষ্টে ৪ ঘন্টা যাবৎ আটক করে রাখে। একই দিন সেখানে সেনাবাহিনী একটি বিয়ে অনুষ্ঠানের জীপও ৩ ঘন্টা পর্যন্ত আটক করে রাখে।

মহালছড়িতে তিন নিরীহ গ্রামবাসী গ্রেফতার

১৫ মার্চ ২০০৯ সেনাবাহিনী কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়ি উপজেলাধীন করল্যাছড়ির সারনাথ অরণ্য কুঠির এলাকা থেকে তিন নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হয়। সারনাথ অরণ্য কুটিরে স্থাপিত ১৩ বীর এর ওয়ারেন্ট কর্মকর্তা মোঃ ওয়াহিদ এই দিন সকাল ৯:০০ টায় ঐ তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন। এ সময় তারা কুঠির এলাকায় গাছ চিরছিল। গ্রেফতারকৃতরা হলেনঃ (১)

শান্তি রঞ্জন চাকমা (৪৫) পীং- মৃত রামচরণ চাকমা, (২) অমরসিং চাকমা (৪০) পীং- বীরসেন চাকমা ও (৩) আমেরিকা চাকমা (৪৫) পীং- কালাবিজা চাকমা। তারা সবাই করল্যাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা। সেনাবাহিনী পরে গ্রেফতারকৃতদের মহালছড়ি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

কুতুকছড়িতে দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার

১৮ মার্চ ২০০৯ রাঙ্গামাটি জেলার কুতুকছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হয়। জানা যায়, কুতুকছড়ি ক্যাম্পের জনৈক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য কুতুকছড়ি গ্রামে অভিযান চালায় এবং অমল চাকমা (৪৫) ও ধর্মচান চাকমা (৪৫) নামের দুই নিরীহ জুম্মকে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

ঘিলাছড়িতে সেটেলার বাঙালীদের কর্তৃক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি

৫ এপ্রিল ২০০৯ শত শত সেটেলার বাঙালী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর উপজেলাধীন ঘিলাছড়িতে রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ সৃষ্টি করে এবং কে বা কারা তাদের আনারস বাগান কেটে দিয়েছে তা যাত্রীদের দেখতে বাধ্য করে। উল্লেখ্য, ঘিলাছড়িতে ভূমি মালিকানাকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরে স্থানীয় জুম্ম ও সেটেলার বাঙালীদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। জানা যায়, জুম্ম গ্রামবাসীদের মালিকানাধীন জায়গাতেই সেটেলার বাঙালীরা আনারসের চারা লাগানো শুরু করলে জুম্মরা নিষেধ করে এবং এর প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু সেটেলার বাঙালীরা এতে ভ্রুক্ষেপ না করলে জুম্মরা তাদের জমির উপর লাগানো আনারসের চারা কেটে দেয়। ফলে এই নিয়ে সেটেলার বাঙালীরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

পরদিন ৬ এপ্রিল ২০০৯ দুপরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিশ্বজিত ভট্টাচার্য খোকন ও পুলিশ সুপার ঘিলাছড়ি সফর করেন। জানা যায়, তারা সেটেলারদের ক্ষতিপূরণ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন এবং সড়ক অবরোধ তুলে নিতে আহ্বান জানান। অপরদিকে, জুম্মরা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার কর্তৃক সেটেলারদের শান্ত করতে তাদের ভূমিকাকে পক্ষপাতিত্বমূলক বলে অভিযোগ করেন। এছাড়া এসময় সেনাবাহিনী জুম্মদের গ্রামে হয়রানিমূলক তল্লাশী অভিযান চালায়।

খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক পৌর কমিশনার প্রহৃত

১৩ এপ্রিল ২০০৯ জুম্মদের জাতীয় সামাজিক উৎসব চলাকালে সেনাবাহিনী খাগড়াছড়ি সদরস্থ জিরো মাইল চেকপোস্টে খাগড়াছড়ি পৌরসভার কমিশনার মোনাং দেওয়ানকে প্রহার করে। উল্লেখ্য, এক জুম্ম নারীকে অপহরণকারী কিছু দুস্কৃতিকারীকে সেনাবাহিনী ঐ চেকপোস্টে আশ্রয় দিচ্ছিল বলে অভিযোগ পাওয়ার পর তা তদন্ত করতে কমিশনার মোনাং দেওয়ান সেখানে যান। মোনাং দেওয়ান প্রহৃত হওয়ার পর শত শত জুম্ম তাদের প্রতিবাদ জানাতে জিরো মাইলে জমায়েত হয়। জানা যায়, প্রহার ঘটনার সাথে যুক্ত সেনা সদস্যদের পরে প্রত্যাহার করা হয়।

নানিয়ারচরের ঘিলাছড়িতে সেটেলার কর্তৃক জুম্ম গ্রামে হামলা

১৪ এপ্রিল ২০০৯ একদল সেটেলার বাঙালী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ইউনিয়নাধীন নবীন চন্দ্র কার্বারী পাড়ায় হামলা চালায়। আচমকা হামলাকালে গ্রামবাসী বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। হামলাকারীরা যদিও বাড়ী-ঘরে আগুন দেয়নি, তবে বাড়ী-ঘর ভাঙচুর ও তছনছ করা হয়। উল্লেখ্য যে, জুম্মদের গ্রাম ও সেটেলার বসতির মধ্যেই বগাছড়ি সেনাক্যাম্প স্থাপিত।

লামায় এক সেটেলার বাঙালী কর্তৃক এক জুম্ম নারী ধর্ষণ ও খুন এর শিকার

৮ মে ২০০৯ বিকাল প্রায় ৫:৩০ টায় বান্দরবান জেলার লামা উপজেলাধীন গজালিয়ায় এক সেটেলার বাঙালী কর্তৃক গজালিয়া গ্রামের রেমং মেম্বার পাড়ার মাচিং খই মারমা (১৮) পীং- চিংনু অং মারমা নামের এক জুম্ম নারী প্রথমে ধর্ষণ ও পরে হত্যার শিকার হয়। ধর্ষণকারী ও হত্যাকারী সেটেলারের নাম হচ্ছে মোঃ জুয়েল এবং ঠিকানাঃ গ্রাম- ভাটিয়া পাড়া (রেল বস্তির পেছনে) কবর খানা রোড, থানা- খালিশপুর, জেলা- খুলনা। ঘটনার সময় দুস্কৃতিকারী মোঃ জুয়েলের বর্তমান ঠিকানা ছিল বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার গজালিয়ার আটমাইল মুসলিম পাড়ার মুনির হোসেনের ফার্ম।

জানা যায়, ধর্ষণ ও হত্যার শিকার মাচিং খই মারমা ঐ দিন আটমাইল গ্রামের নাজমুল ইসলামের পরিত্যক্ত ইটখোলায় কিছু ইট সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। এ সময় দুস্কৃতিকারী জুয়েল মাচিং খই মারমাকে জোরপূর্বক আঁকড়ে ধরে এবং এক পর্যায়ে পাশব কায়দায় ধর্ষণ করে। পরে ধর্ষণকারী ইট দিয়ে পেছন থেকে মাথায় আঘাত করে এবং গলায় কাপড় পেচিয়ে ধরে মাচিং খই মারমাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এই ঘটনার সময়, দেলোয়ার হোসেন (১৩) নামের এক রাখাল বালক পার্শ্ববর্তী বন থেকে ঘটনাটি দেখতে পায় এবং পরদিন গ্রামবাসীদের বলে দেয়। এরপর, ধর্ষণ ও হত্যার শিকার মাচিং খই মারমার বাবা প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীদের নিয়ে ধর্ষণকারী ও হত্যাকারী জুয়েলকে তুলে এনে লামা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে এবং লামা থানায় পেনাল কোডের অনুচ্ছেদ ৩০২ এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করে। মামলার নম্বর ৩/৪৫ তারিখ ৯ মে ২০০৯।

রাঙ্গামাটিতে জেএসএস ও পিসিপি নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের

১৫ মে ২০০৯ তথাকথিত সংস্কারপন্থী দলের সমর্থক হিসেবে পরিচিত প্রগতি চাকমার উপর গুলি বর্ষণের ঘটনার ব্যাপারে রাঙ্গামাটির কোতয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি গুনেন্দু বিকাশ চাকমা, সমিতির নানিয়ারচর উপজেলা শাখার আহ্বায়ক জ্ঞান রঞ্জন চাকমা, সমিতির রাঙ্গামাটি শহর শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নীলোৎপল খীসা, সমিতির সদস্য অংকুর চাকমা ও ছাত্রনেতা ফদাংতাং চাকমা, ধীরাজ চাকমা, পহেল চাকমা, শুভজ্যোতি চাকমাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ পাওয়া যায়, প্রগতি চাকমা মাদকাসক্ত যুবকদের কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হন। তবে উক্ত ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দকে হয়রানির উদ্দেশ্যে মামলায় জড়িত করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মহল সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

রাঙ্গামাটিতে পুলিশ কর্তৃক পিসিপি নেতা গ্রেফতার

১৬ মে ২০০৯ একটি অপহরণ মামলার ব্যাপারে পুলিশ রাঙ্গামাটি শহরের কাঠালতলী এলাকা হতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শুভজ্যোতি দেওয়ানকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য, ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ছাত্রনেতা শুভজ্যোতি দেওয়ান, যুবনবিকাশ চাকমা, অধিরাম চাকমা, চাইনিজ চাকমা, ফদাংতাং চাকমা, তুহিন চাকমা, পহেল চাকমার বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করা হয়। জানা যায়, ঐ সময় একজন বন্ধুসহ কালোমনি চাকমাকে একদল তরুণ অপহরণের চেষ্টা করে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালোমনির বাবা একটি মহলের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে উক্ত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তবে আলোচনার পর কালোমনির বাবা উক্ত মামলা তুলে নিতে সম্মত হন। তা সত্ত্বেও হয়রানির উদ্দেশ্যে শুভজ্যোতি দেওয়ানকে গ্রেফতার করা হয়। জানা যায়, পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাত্র নেতৃবৃন্দের কাছে বলেন যে, একটি প্রভাবশালী মহলের চাপের কারণে শুভজ্যোতিকে গ্রেফতার করা ছাড়া তার কোন বিকল্প ছিল না।

শুভজ্যোতিকে গ্রেফতারের পর পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাণী দয়া ময়ী উচ্চ বিদ্যালয় সড়কে বিক্ষোভ সমাবেশের অয়োজন করে এবং টায়ার পুড়িয়ে তিন ঘন্টা যাবৎ সড়ক অবরোধ করে রাখে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ধর্মঘট ডাকারও পরিকল্পনা নেয়, কিন্তু পুলিশ আদালতে জামিন আবেদনে কোন অভিযোগ করবেনা বলে নিশ্চয়তা দিলে সে পরিকল্পনা বাদ দেয়া হয়। ১৭ মে ২০০৯ শুভজ্যোতিকে আদালতে হাজির করা হয় এবং ২৪ মে ২০০৯ জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

নানিয়ারচরে ক্যাপ্টেন শামীম কর্তৃক বৌদ্ধ ভিক্ষু অপমানিত

২১ মে ২০০৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর উপজেলাধীন বেতছড়ি সেনাক্যাম্পের কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন শামীম নানিয়ারচরের রত্নাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহারের প্রধান ধর্মীয় গুরু বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষুকে হয়রানি, এমনকি প্রহারের চেষ্টা করে। এ সময় বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু তাঁর অনুসারী ভিক্ষু ও শ্রামনদের নিয়ে মহালছড়ি উপজেলার কেঙেলছড়ি এলাকার তবলছড়ি গ্রামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে ফিরছিলেন।

জানা যায়, ঐ দিন সকাল ১০:৩০ টায় বেতছড়ি সেনাক্যাম্পের চেকপোস্টে পৌছলে বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষুকে বহনকারী গাড়ীটি থামানো হয়। সেনাবাহিনী তল্লাশীর জন্য গাড়ী থেকে যাত্রীদের নামতে নির্দেশ দেয়। তবে, অন্যান্যরা নামলেও বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু গাড়ী থেকে নামতে অস্বীকৃতি জানান। যেহেতু ইহা বৌদ্ধ বিহারের গাড়ী, তাই তিনি তল্লাশী না চালানোর জন্য যুক্তি দেখান। এতে ক্যাপ্টেন শামীম বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষুর সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং একটি রশি দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করেন। ইতোমধ্যে সেনাক্যাম্পের পাহাড় চুড়া থেকে একদল সেনাসদস্য রশি নিয়ে চেকপোস্টে নেমে আসে। প্রায় দেড় ঘন্টা পর নানিয়ারচর জোনের সেকন্ড-ইন-কমান্ড ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চান এবং ভিক্ষুদের নানিয়ারচরে বৌদ্ধ মন্দিরে যাওয়ার অনুমতি দেন।

এই বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়রানির প্রতিবাদে নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জানা যায়, প্রতিবাদ কর্মসূচী থেকে ফেরার পথে নানিয়ারচরে মিস যুথিকা চাকমা ও মিস মিকা চাকমা নামের দুই মহিলাকে আটক করা হয়। পরে সাদা কাগজে দস্তখত নিয়ে নানিয়ারচর জোন থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়।

ইউপিডিএফ কর্তৃক জেএসএস সদস্য খুন

২৩ মে ২০০৯ রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নের সুবলং বাজার এলাকায় ইউপিডিএফ-র সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রুবেল চাকমা (৩০) নামের স্থানীয় এক জেএসএস নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করে। নিহতের পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঐ দিন বিকাল ৩:৪৫ টায় সুবলং বাজারের উত্তরে বনবিভাগের কার্যালয়ের পার্শ্ববর্তী একটি গাছের নীচে বন্ধুদের নিয়ে রুবেল চাকমা তাস খেলছিল। এ সময় পেছন থেকে মুখ পরিচিত ইউপিডিএফ-র এক সন্ত্রাসী ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রুবেলকে হত্যা করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে পালিয়ে যায়।

বরকলে ইউপিডিএফ কর্তৃক জেএসএস নেতা অপহৃত

৫ জুন ২০০৯ সকাল প্রায় ৭:০০ টায় ইউপিডিএফ-র সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক জেএসএস-র রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন বরকল ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি কমলেন্দু বিকাশ দেওয়ান (৪৭) পীং- মুরোল্যা দেওয়ানকে বরকল ইউনিয়নের কুসুমছড়ি মুখ এলাকার নিজ বাড়ী থেকে অপহরণ করে। জানা যায়, কুসুমছড়িমুখ এলাকার পহ্‌র (প্রখর) চন্দ্র চাকমা (৪৩) নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-র একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী কুসুমছড়ি এলাকায় তল্লাশী চালায় এবং অস্ত্রের মুখে অমলেন্দু বিকাশ দেওয়ানকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঐ সময় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অন্য তিন নিরীহ গ্রামবাসীকেও ব্যাপক মারধর করে।

রাঙ্গামাটিতে ইউপিডিএফ কর্তৃক জেএসএস ও পিসিপি নেতা অপহৃত

৭ জুন ২০০৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলাধীন ধল্যাছড়ি গ্রামের স্ব স্ব বাড়ী থেকে ইউপিডিএফ-র সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-র দুই নেতা অপহৃত হন। অপহৃত দু'জন হলেন (১) বিজিমনি চাকমা (৩৫), সদস্য, জীবতলি ইউনিয়ন কমিটি, জেএসএস ও (২) সুনির্মল দেওয়ান (২৮), সভাপতি, জীবতলি ইউনিয়ন কমিটি, পিসিপি। ঐ দিন বিকাল প্রায় ৪:৩০ টায় তপন কুমার চাকমার নেতৃত্বাধীন ১২ সদস্য বিশিষ্ট ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের একটি দল ধল্যাছড়ির স্থানীয় কাঠ ব্যবসায়ীদের কার্যালয়ে তল্লাশী চালায় এবং অস্ত্রের মুখে জেএসএস ও পিসিপির উপরোক্ত সদস্যদের তুলে নিয়ে যায়।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ক্যান্টনমেন্টের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের চেষ্টা

স্থানীয় জেএসএস, জনপ্রতিনিধি ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ

৮ জুন ২০০৯ বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলার স্থানীয় জেএসএস নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন যে, রুমা উপজেলায় সেনাবাহিনীর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রক্রিয়া চলছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, ৪ হাজারেরও অধিক আদিবাসী জনগণ তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে উচ্ছেদ হবে, যদি বান্দরবানের রুমা ক্যান্টনমেন্ট সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ৯,৫৬০ একরের ব্যাপক ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। আদিবাসী জনগণকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্য নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট সম্প্রসারণের নামে সেখানে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। রুমা উপজেলার জেএসএস নেতৃবৃন্দ এক সমাবেশে রুমা উপজেলায় সেনাবাহিনীর জন্য ভূমি অধিগ্রহণের এই প্রক্রিয়াকে বাতিলের দাবী জানান।

ঐ দিন একই দাবীতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও আদিবাসী সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ পাঁচ শ' ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপিও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

জনসংহতি সমিতির রুমা উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক লুপ্রু মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমিতির রুমা উপজেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক থোয়াই সা নু মারমা, যুগ্ম সম্পাদক ফ্রান্সিস ত্রিপুরা এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, উপজেলা শাখার সভাপতি হ্লা থোয়াই হ্লি মারমা ও সাধারণ সম্পাদক ক্যসা প্রু মারমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া যদি বাতিল করা না হয়, তাহলে তাতে গোটা বান্দরবানে বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং আদিবাসী জনগণের সামাজিক শৃঙ্খলা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাদের জন্য টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

বক্তারা বলেন, প্রায় ১১,৫০০ একর ভূমি লীজ দিয়ে এখন বহিরাগত লোকদের পুনর্বাসিত করা হচ্ছে, যা বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক এলাকায় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের নামে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

জেলা প্রশাসনের ভূমি শাখার সূত্রে জানা যায় যে, প্যারা কমান্ডো প্রশিক্ষণ এবং রুমা ক্যান্টনমেন্ট সম্প্রসারণের জন্য পায়েন্দু, সেঙ্গুম ও গালেঙ্যা মৌজায় ৯,৫৬০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। ঐ এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী জনগনের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কয়েকবার জরিপও চালানো হয়।

রুমা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সেঙ্গুম মৌজার হেডম্যান উহ্লাচিং মারমা বলেন যে, যদিও বিধি মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণের মত কর্মকান্ডে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট মৌজা হেডম্যানকে অবহিত করতে হয়, কিন্তু তাদের কাউকেই অবহিত করা হয়নি।

বাঙালী পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সাজেকের রুইলুই এলাকায় বিডিআর কর্তৃক বাজার স্থাপনের চেষ্টা

১২ জুন ২০০৯ মারিশ্যা বিডিআর ক্যাম্পের কম্যান্ডিং অফিসার সাজেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এল থাঙা পাঙখোয়াকে সাথে নিয়ে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের ১৬৭নং রুইলুই মৌজার রুইলুই এলাকা সফর করেন। সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল রুইলুই বিডিআর ক্যাম্পের পাশ্ববর্তী এলাকায় একটি বাজার স্থাপন করা। বাজারটি স্থাপনের জন্য বিডিআর কম্যান্ডার ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। পরিদর্শনের পরপরই ৬টি দোকানঘর নির্মাণ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে যে, সীমান্ত এলাকার সর্বত্র সেটেলার বাঙালীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে বিডিআর ঐ এলাকায় একটি বাজার স্থাপনের চেষ্টা করে আসছে। জানা যায়, বিডিআরের ভারতের মিজোরাম রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন রুইলুই এলাকার ১০ ও ৯ মাইল স্থানে বাঙালী সেটেলার বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। স্থানীয় জনগণ ঐ এলাকায় বাজার স্থাপনকে বিরোধীতা করে আসছিল। রুইলুই মৌজার হেডম্যান লাল থাঙা লুসাইও এর বিরোধীতা করে আসছিলেন।

রাঙ্গামাটিতে এক জুম্ম যুবক গুলিবিদ্ধ

১৩ জুন ২০০৯ রাত প্রায় ৮:০০ টায় রাঙ্গামাটি শহরের বনরূপা এলাকার কল্লোল চাকমা (২৩) পীং- প্রভাত চাকমা নামের এক জুম্ম যুবক বনরূপা এলাকার সমতাঘাটে অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতিকারী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হন। জানা যায়, কল্লোল চাকমা মাদকাসক্ত। স্থানীয়রা জানায় যে, মাদকাসক্তদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। স্থানীয়দের মতে, কল্লোল চাকমা দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় একটি মাদকাসক্ত দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। উল্লেখ্য, ২ মে ২০০৯ একইভাবে মাদকাসক্ত যুবকদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত হয়। এতে রনি চাকমা ও সজল চাকমা নামে দুই যুবক আহত হয়।

রামগড়ে জুম্ম গ্রামবাসী ও বাঙালী সেটেলারদের মধ্যে সংঘর্ষ

১৪ জুন ২০০৯ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপজেলাধীন জালিয়াপাড়া এলাকায় জুম্ম গ্রামবাসী ও বাঙালী সেটেলারদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। জানা যায়, জালিয়াপাড়া গুচ্ছগ্রামের সেটেলার বাঙালীরা বেশ কিছু দিন ধরে রামগড় উপজেলাধীন হাফছড়ি ইউনিয়ন ও বরইতলী মৌজার বরইতলী এলাকার জুম্ম গ্রামবাসীদের ভূমি বেদখলের চেষ্টা করে আসছিল। জালিয়াপাড়া গুচ্ছগ্রাম থেকে বরইতলী এলাকাটি প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরবর্তী। এর পূর্বে ৭ জুন ২০০৯ সেটেলার বাঙালীরা ঐ এলাকার জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং অন্ততঃ ১৫টি ঘর নির্মাণ করে। এরপর ১৪ জুন সকালে প্রায় ৭০ জনের সেটেলার বাঙালীদের একটি দল ঐ এলাকায় যায় এবং ঘর নির্মাণ করতে শুরু করে। জুম্মরা এই ঘর নির্মাণে বাঁধা প্রদান করে। এক পর্যায়ে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে ১০ জন সেটেলার বাঙালী আহত হয়ে গুইমারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে জানা যায়।

জালিয়া পাড়া ও গুইমারা গুচ্ছগ্রামের সেটেলার বাঙালীরা এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে নির্বিচারে খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কস্থ জালিয়াপাড়া এলাকায় নিরীহ জুম্মদের উপর হামলা চালায়। জানা যায়, ৫ মারমা রিকশা চালককে ব্যাপক মারধর করা হয়। তাদের মধ্যে থইহ্লা প্রু মারমা (৩৫) পীং- অংগ্যজাই মারমা, সাং- লাব্রেছড়ি হেডম্যান পাড়া, গুইমারা ইউনিয়ন ও আপ্রুসি মারমা (৩৫) পীং- রেম্রোচাই মারমা, সাং- লুব্রেপাড়া, গুইমারা ইউনিয়ন নামের দুইজন রিকশা চালককে চিহ্নিত করা যায়। জানা যায়, মহালছড়ি উপজেলাধীন সিঙ্গুকছড়ি ইউনিয়নের সিঙ্গুকছড়ি গ্রামের ধনদাস ত্রিপুরা (২১) পীং- সুকুমার ত্রিপুরা সেখানে পৌঁছলে কাঠ ও লোহার রড দিয়ে একদল সেটেলার বাঙালী কর্তৃক নির্মমভাবে প্রহারের শিকার হন। তবে কোনমতে পালাতে সক্ষম হলেও ধনদাস ত্রিপুরা মারাত্মক আহত হন।

জালিয়াপাড়া ও গুইমারা গুচ্ছগ্রামের সেটেলার বাঙালীরা বড়ইতলী এলাকার জুম্ম গ্রামবাসীদের জমায়েত হয়। তবে, সেনাবাহিনী তাদের বাঁধা দেয়। অপরদিকে, খাগড়াছড়ি জেলার সাংসদ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি, চেয়ারম্যান, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স উভয় সম্প্রদায়কে পাল্টা হামলা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

সাজেকে ৬ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী নির্যাতনের শিকার

২০ জুন ২০০৯ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেকে সেনা অভিযান চলাকালে ৬ নিরীহ জুম্ম নির্যাতনের শিকার হন। জানা যায়, সেনাবাহিনীর বাঘাহাট জোনের একদল সেনাসদস্য এএসএফ পাড়ায় আচমকা অভিযান পরিচালনা করে। সেনাসদস্যরা গ্রাম ঘেরাও করে এবং তাদের ভাষায় সন্ত্রাসীদের খুঁজতে থাকে। কোন সন্ত্রাসী খুঁজে না পেলে সেনাসদস্যরা ৬ নিরীহ গ্রামবাসীকে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে কঠোর নির্যাতন চালায়। সেনাসদস্যরা আটক গ্রামবাসীদেরকে লাঠি দিয়ে মারধর করে এবং শরীরে বৈদ্যুতিক শক দেয়। নির্যাতনের শিকার ৬ নিরীহ গ্রামবাসীর মধ্যে ৫ জন হলঃ

(১) বাল্যা চাকমা (৫০), গ্রাম- এমএসএফ পাড়া;

(২) চুচ্যাঙ নাগা চাকমা (৪০), গ্রাম- ভুয়াছড়ি;

(৩) জগদীশ চাকমা (৪০), গ্রাম- করেঙ্গাতলী;

(৪) অমরধন চাকমা (৪৫), গ্রাম- নাক্সাছড়ি;

(৫) কালাধন চাকমা (৫০), গ্রাম- গঙ্গারাম দোর।

পরে দ্বিতীয় দফায় আটককৃতদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

বরকলের সুবলং বাজারে সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ জুম্ম যুবক নিহত

২৬ জুন ২০০৯ রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন সুবলং বাজার এলাকায় মেজর মঞ্জুর, ওয়ারেন্ট অফিসার সাইফুল ও কর্পোরাল আতিকের নেতৃত্বে ৬ বেঙ্গলের সুবলং সেনাক্যাম্পের সেনাসদস্যদের কর্তৃক তরুণ কুসুম চাকমা (৩০) পীং- গুণধর চাকমা নামের এক নিরীহ জুম্ম তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। উল্লেখ্য, তরুণ কুসুম চাকমা বরকল উপজেলাধীন হরিণা ইউনিয়নের ভূষণছড়া এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, তবে বর্তমানে সে রাঙ্গামাটি পৌর এলাকাধীন মৈত্রীনগর এলাকা বসবাস করছে। সে একজন নিরীহ যুবক এবং কখনও দিন মজুরী করে কখনও বনজদ্রব্য সংগ্রহ করে সে কোন জীবিকা নির্বাহ করছিল। কয়েক দিন আগে সে উপার্জনের লক্ষে সুবলং বাজারে যায়। বলা বাহুল্য, সে একজন চুক্তি সমর্থকও।

জানা যায়, ২৬ জুন শুক্রবার ছিল সুবলং বাজার বার। অন্যান্য গ্রামবাসীর মত তরুণ কুসুমও সেদিন সুবলং বাজারে যায়। তবে, সকাল প্রায় ৯:৩০ টায় সে যখন লঞ্চ থেকে সুবলং বাজারে নামে তখন মিন্টু বিকাশ চাকমার (যে ভূমিহীন মিন্টু নামে পরিচিত) সহায়তায় চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের একটি দল তাকে ধরে ফেলে। তারপর ব্যাপক মারধরের পর ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা সুবলং ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের কাছে তরুণ কুসুমকে হস্তান্তর করে। তবে, জিজ্ঞাসাবাদের পর কোন কিছু না পেলে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ তাকে ছেড়ে দেয়।

সেনা সদস্যদের হেফাজত থেকে মুক্ত হওয়ার পর তরুণ কুসুম যখন বাজারে আসে তখন ইউপিডিএফ-র সদস্যরা তাকে আবার ধরার চেষ্টা করে। জীবন বাঁচানোর আর কোন উপায় না দেখে সে কাপ্তাই হ্রদে ঝাঁপ দেয়। ঐ সময় উক্ত ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার সাইফুল ও কর্পোরাল আতিকের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য ও ইউপিডিএফ-র একটি দল আলাদা দু'টি বোট নিয়ে সাঁতাররত তরুণ কুসুমকে তাড়া করতে থাকে। কিন্তু তরুণ কুসুম যখন বাজারের কাছে ধনমিয়া সমাধির পার্শ্ববর্তী তীরে উঠে আছে তখন সেনাসদস্যরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে পায়ে ও অন্ডকোষে গুলি লাগলে তরুণ কুসুম মারাত্মকভাবে আহত হয়। এরপরও সেনাসদস্যরা তরুণ কুসুমকে নৃশংসভাবে নির্যাতন করতে থাকে। এক পর্যায়ে তরুণ কুসুম চাকমার গলা ভেঙে যায়। সেনাসদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে এলেন চাকমা নামের আরও এক যুবককে গ্রেফতার করে। ইউপিডিএফ এলেন চাকমাকে তাদের সদস্য বলে দাবী করে এবং তথাকথিত দুস্কৃতিকারীকে ধরতে সাহায্য করতে সে এখানে এসেছিল বলে দাবী করে।

ঘটনার পর সুবলং এর সেনাক্যাম্প কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমেই জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ঘটনার সাজানো ও বানোয়াট বিবরণ প্রচার করে। সেনাবাহিনী প্রথমে প্রচার করে যে, তরুণ কুসুম চাকমার নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একদল দুস্কৃতিকারী নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটাতে সুবলং বাজারের দিকে অগ্রসর হয়। সকাল প্রায় ১১:০০ টায় সশস্ত্র দুস্কৃতিকারীরা ধনমিয়া সমাধির পাশ্ববর্তী স্থানে পৌঁছার খবর পেলে সেনাবাহিনী সেখানে তাদের মোকাবেলা করে। এক

পর্যায়ে দুস্কৃতিকারীরা সেনাবাহিনীর দিকে গুলি চালিয়ে পালাতে শুরু করে। সেনাবাহিনীও পাল্টা জবাব দেয় এবং এতে ঘটনাস্থলে তরুণ কুসুম চাকমা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

সেনাবাহিনী আরও দ্বিতীয় কাহিনী ফাঁদে যে, সুবলং বাজারের পাশে দুই প্রতিপক্ষ গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী সেখানে ছুটে যায় এবং ঘটনাস্থল থেকে তরুণ কুসুম চাকমার লাশ উদ্ধার করে। সেনাবাহিনী আরও তৃতীয় কাহিনী প্রচার করে যে, সেনাবাহিনীর একটি নিয়মিত টহল দল যখন ধনমিয়া সমাধিতে পৌঁছে, তখন তরুণ কুসুম চাকমার নেতৃত্বে দুস্কৃতিকারীরা সশস্ত্র হামলা চালায়। এমনকি সেনাবাহিনী তরুণ কুসুম চাকমাকে প্রথমে জগদীশ চাকমা বলে উল্লেখ করে।

এই সমস্ত কাহিনীসমূহ সম্পূর্ণ সাজানো এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বাজারে যে সমস্ত লোকজন এসেছিল তারা প্রত্যক্ষ করে যে, ইউপিডিএফ সদস্যরাই তরুণ কুসুমকে ধরে এবং সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করে। নিহতের ছোট ভাই পলাশ চাকমা বলে যে, সে কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিল না। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এটাও উল্লেখযোগ্য যে, ইউপিডিএফ-র রাঙ্গামাটি জেলার প্রধান শান্তিদেব চাকমা প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে ঘটনার সময় গ্রেফতারকৃত এলেন চাকমাকে ইউপিডিএফ-র সদস্য বলে দাবী করে। শান্তিদেব উল্লেখ করে যে, দুস্কৃতিকারীকে ধরতে সেনাদের সাহায্য করতেই এলেন সেখানে গিয়েছিল এবং সেনাবাহিনী ভুলে তাকে গ্রেফতার করেছিল। ইউপিডিএফ-র এই বিবৃতি প্রমাণ করে যে, ইউপিডিএফ-র সদস্যরা উক্ত হিংসাত্মক হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল।

ঐ দিন বিকেলে ময়না তদন্তের জন্য লাশটি রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়। পরদিন ২৭ জুন দুপুরে নিহতের বড় বোন ও ছোট ভাইকে লাশটি হস্তান্তর করা হয়।

বান্দরবানে ২০০ ম্রো পরিবার ভূমি বেদখলকারী ও সন্ত্রাসীদের ভয়ে আতঙ্কিত

বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নাধীন রঞ্জুপাড়া, পেনাইপাড়া, চাক্কোইপাড়া ও বাট্যাপাড়ায় সংখ্যালঘু ম্রো জনগোষ্ঠীর প্রায় ২০০ পরিবার ভূমি বেদখলকারী ও সন্ত্রাসীদের ভয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। (সূত্রঃ ২৫ জুন ২০০৯, দৈনিক প্রথম আলোর সংবাদ প্রতিবেদন)

পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয় যে, '১৮ জুন পেনাইপাড়া গ্রামে হামলার পর থেকে এলাকাবাসী তাদের উপর আবার সন্ত্রাসী হামলার ভয়ে জীবনযাপন করে আসছে।'

'বান্দরবানের প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে গ্রামবাসী তাদের অনিরাপত্তাবোধের ব্যাপারে কথা বলেন। টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং গ্রাম প্রধানগণ সংবাদ সম্মেলনে ভূমি বেদখলকারী শাহ আলম ও তার সন্ত্রাসী দলের সদস্যদের গ্রেফতার ও বিচারে নিয়ে আসার দাবী জানান।'

'সংবাদ সম্মেলনে টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পূর্ণ চন্দ্র ম্রো বলেন, চট্টগ্রামের লোহাগারা উপজেলাধীন চোরোম্বা এলাকার বাসিন্দা শাহ আলম তার রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী দলের সহায়তায় বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ম্রো জনগোষ্ঠীর শত শত একর ভূমি দখল করে। ফলে, রঞ্জুপাড়া ও পেনাইপাড়ার ম্রো জনগণ গত তিন বছর যাবৎ জুম চাষ করতে পারেনি, ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়ে এবং দুঃসহ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করা হলেও কোন কাজ হয়নি।'

'রঞ্জুপাড়ার গ্রাম প্রধান লুরিং ম্রো ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বংশ পরম্পরায় আমরা যেখানে জুম চাষ করে আসছি, আমি আর সেই ভূমিতে প্রবেশ করতে পারি না। তিনি বলেন, রেংগ্রাও যখন জুমে কাজ করছিল, তখন শাহ আলম ও তার সন্ত্রাসীরা তাকে নির্যাতন করে। সে এখনও বান্দরবান জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। শাহ আলমসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তবে পুলিশ তখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।'

'ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মাজেদা বেগম ও আশরাফ মিয়া সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, তারা ম্রোদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছেন। শাহ আলম অবৈধভাবে সরল ও শান্তিপূর্ণ ম্রো জনগোষ্ঠীর ভূমি দখল করেছেন বলে ম্রোরা তাদের জুমভূমিতে চাষাবাদ করতে পারছেন না এবং এ জন্য তাদের না খেয়ে থাকতে হবে।'

'বান্দরবান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনুপম বড়ুয়া বলেন, টংকাবতীতে শাহ আলমের কোন জমি নেই। সে ম্রো জনগোষ্ঠীর জুমভূমি দখল না করার নির্দেশকে উপেক্ষা করেই এ সব করছে।'

বহিরাগত লীজ মালিকদের কর্তৃক ১২টি ম্রো গ্রামের অধিবাসীকে হুমকী

১ জুলাই ২০০৯ বান্দরবানে বহিরাগত বাঙালী লীজ মালিকরা লেমু পালঙ মৌজা ও দুলুছড়ি মৌজাধীন ১২ গ্রামের ২২৮ পরিবার ম্রো গ্রামবাসীকে এলাকা ছাড়ার হুমকী দেয় এবং তা না হলে কঠিন পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে বলে উল্লেখ করে। এ ব্যাপারে ম্রো

গ্রামবাসী ন্যায় বিচার চেয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি দেয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়নি।

বান্দরবানে জোরপূর্বক ভূমি বেদখল মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তার স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনের নামে বাকখালি মৌজাধীন ২৩৪ একর ভূমিতে এবং আলিক্ষ্যং মৌজাধীন ১৫০ একর ভূমিতে বনজ ও ফলজ বাগান গড়ে তুলেছেন।

দীঘিনালায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক প্রতিবন্ধী জুম্ম নারী ধর্ষিত

৩১ জুলাই ২০০৯ খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন বড়াদম-র দীঘিরপার এলাকার শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ২০ বছরের মিনা চাকমা পীং- সুনীল কান্তি চাকমা নামের এক তরুণী গ্রামীণ ব্যাংকের মাঠকর্মী সেটেলার বাঙালী নজরুল ইসলাম কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। জানা যায়, ঐ দিন বিকাল প্রায় ৩:৩০ টায় গ্রামীণ ব্যাংকের মাঠকর্মী নজরুল ইসলাম ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করতে মোটর সাইকেল যোগে দীঘিরপারে যায়। পানি খাওয়ার নামে সে তখন উক্ত চাকমা তরুণীর ঘরে ঢুকে পরে এবং বাড়ীতে একা পেয়ে প্রতিবন্ধী এই তরুণীকে ধর্ষণ করে। তরুণীর মা-বাবা যখন ঘরে ফেরেন তখন তাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পায়। তৎক্ষনাৎ ধর্ষিতাকে দীঘিনালা উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় এবং তারপর খাগড়াছড়ি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ধর্ষিতার অভিভাবকের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে দীঘিনালা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। তবে, রিপোর্টটি লেখা পর্যন্ত ধর্ষণকারীকে গ্রেফতার করা হয়নি।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্ম গ্রামে হামলার চেষ্টা

১৪ আগষ্ট ২০০৯ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন বগাচদর ইউনিয়নে সেটেলার বাঙালীদের একটি দল জুম্ম গ্রামে হামলা চালানোর চেষ্টা করে। এতে অন্ততঃ ৪ জন জুম্ম গ্রামবাসী প্রহারের শিকার হয় এবং লুটপাতের শিকার হয়।

জানা যায় যে, ৩৫ টি অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের সাম্প্রতিক সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী লংগদুর কাঠালতলী ক্যাম্প প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং সে অনুযায়ী ১৩ আগষ্ট ২০০৯ ক্যাম্পটির ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জনকে লংগদু জোনে নিয়ে আনা হয় এবং বাকী সদস্যদের ১৪ আগষ্ট ২০০৯ তারিখে প্রত্যাহার করার কথা।

জানা যায়, ১৪ আগষ্ট ২০০৯ ভোর সকালে কাঠালতলী ক্যাম্পের নিকটবর্তী বগাচদর ইউনিয়নের থেগাপাড়া এলাকার সেটেলার বাঙালীরা ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী স্থানে এসে জমায়েত হয় এবং সেনা প্রত্যাহার প্রতিরোধের নামে ক্যাম্প অবরোধ করে। এক পর্যায়ে সকাল ১১:৩০ টায় থেগাপাড়ার সেটেলার বাঙালীদের একটি দল ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটা সজ্জিত হয়ে রঞ্জিতপাড়া ও বগাচতর নামে জুম্ম গ্রামে হামলা চালানোর চেষ্টা করে। তবে, জুম্ম গ্রামবাসী সেটেলার বাঙালীদের এই হামলা মোকাবেলা করে।

এ সময় থেগাপাড়া গ্রামে সেটেলার বাঙালীদের কর্তৃক নিম্নোক্ত জুম্ম গ্রামবাসী হামলার শিকার হয়। এ সময় জুম্মরা বৈরাগী দোকান বাজার থেকে বাড়ীতে ফিরছিল। জুম্মরা ব্যাপক মারধর ও লুটপাতের শিকার হয়। ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা হলঃ

১. ভীম চাকমা (২২) পীং- বাঁশী মোহন চাকমা, গ্রাম- রঞ্জিত পাড়া;

২. সূর্য চাকমা (৩৮) পীং- মৃত রাঙাচান হেডম্যান, গ্রাম- চিবারেগা;

৩. অমলেন্দু চাকমা (৩৫) পীং- বড় বন্ধু চাকমা, গ্রাম- রঞ্জিত পাড়া;

৪. চন্দ্র মোহন হেডম্যান ওরফে বন্দুক্যা (৬৮) পীং- মৃত জর্মজয় চাকমা, গ্রাম- রাঙ্গীপাড়া।

সেটেলার বাঙালীদের কর্তৃক তারা প্রহৃত ও লুটপাতের শিকার হয়নি এই মর্মেও তাদেরকে সাদা কাগজে দস্তখত দিতে বাধ্য করা হয়।

জানা যায় যে, ঘটনার খবর পেয়ে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জানে আলম, লংগদু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দজ্জালা ও কাঠালতলী ক্যাম্পের জনৈক সুবেদার দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তবে, তারা সেটেলার বাঙালীদের ব্যতীত জুম্ম গ্রামবাসীদের থেকে সকল লাঠিসোটা জব্দ করেন। এ সময় তারা কাঠালতলী ক্যাম্পে সেটেলার বাঙালী ও জুম্ম গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভাও করেন। সভায় উভয় পক্ষকে নিয়ে তারা একটি কমিটি গঠন করে দেন। কমিটির সদস্যদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের লোকদের শান্ত করার অনুরোধ জানানো হয়। তবে, জুম্ম প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন যে, জুম্মরা বাঙালীদের হামলা চালায়নি, বরং বাঙালীরাই হামলা চালিয়েছে। সুতরাং বাঙালী সেটেলারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

নাইক্ষ্যংছড়িতে চাক এলাকায় বিডিআর ও র‍্যাবের যৌথ অভিযান

১৬ আগষ্ট ২০০৯ বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি ক্যাম্পের ১৫ ব্যাটালিয়নের বিডিআর ও র‍্যাব এর একটি দল যৌথভাবে রাবার বাগানের তত্ত্বাবধায়ক হেফাজউদ্দিনকে উদ্ধারের নামে উপজেলার চাক অধ্যুষিত বাইশারী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। উল্লেখ্য যে, হেফাজউদ্দিন ও বাগান শ্রমিক মোঃ নাজের ১৫ আগষ্ট ২০০৯ নিজেকে ইউপিডিএফ-র সদস্য বলে পরিচয় দানকারী প্রকাশ চাকমার নেতৃত্বে চাঁদাবাজদের একটি দল কর্তৃক অপহৃত হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। পরে, অপহরণকারীরা মোঃ নাজেরকে মুক্তি দেয় এবং রাবার বাগানের তত্ত্বাবধায়ক হেফাজউদ্দিনকে মুক্তির জন্য মুক্তিপন দাবী করে।

জানা যায় যে, অভিযান চলাকালে বিডিআর ও র‍্যাব প্রথমে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন বাদুড়ঝিরি চাক পাড়াটি ঘেরাও করে এবং চাক জনগোষ্ঠীর ৭ নিরীহ জুম চাষীকে ধরে নিয়ে যায়। গ্রেফতারের পরপরই তাদেরকে স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা হয়। পরে অংচাগ্যা চাক ব্যতীত সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রেফতারের পর অংচাগ্যা চাককে বিডিআর এর হেফাজতে রাখা হয়।

আবার ২২ আগষ্ট ২০০৯ বিডিআর ও র‍্যাব যৌথভাবে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় তারা অনুসন্ধান অভিযানের জন্য সহযোগী হিসেবে আরও ১২ চাক গ্রামবাসীকে নিয়ে যায়। তবে, বিডিআর ও র‍্যাব অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারা নিরীহ চাক গ্রামবাসী সহযোগীদের উপর রাগান্বিত হয়। তারপর বিডিআর ও র‍্যাব কর্তৃক স্থানীয় একটি জুনিয়ার হাই স্কুলে চাক গ্রামবাসীদের জড়ো করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে তাদের অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হয়। ১২ চাক গ্রামবাসী ছাড়াও সেখানে আর ৮ চাক গ্রামবাসীকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা হয়। ঐ দিন নির্যাতনের পর অধিকাংশ গ্রামবাসীকে ছেড়ে দেয়া হলেও ৭ নিরীহ গ্রামবাসীকে বিডিআরের হেফাজতে রাখা হয়।

২৩ অক্টোবর ২০০৯ চাক গ্রামবাসী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বান্দরবান পার্বত্য জেলার সাংসদ বীর বাহাদুর এর সাথে সাক্ষাৎ করে। বীর বাহাদুর বিষয়টি দেখবেন বলে নিশ্চয়তা দেন। আরও জানা যায়, ঐ দিন বিকেলে আরও ৫ গ্রামবাসীকে মুক্তি দেয়া হয়। তবে, নিম্নোক্ত দুই ব্যক্তিকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং আদালতে হাজির করা হয়-

১. অংচাগ্যা চাক (৩৭) পীং- থুইলা খই চাক, গ্রাম- বাদুড়ঝিরি গ্রাম;

২. মং ওয়াই চাক (২০) পীং- কিজইরী চাক, গ্রাম- মধ্যম চাক।

অবশেষে জানা যায় যে, অপহরণকারীরা ২৪ আগষ্ট ২০০৯ সকাল ৮:০০ টায় আলিকদমে অপহৃত হেফাজউদ্দিনকে ছেড়ে দেয়। আরও জানা যায় যে, ২৬ আগষ্ট ২০০৯ স্থানীয় চাক গ্রামবাসীরা ক্যচাই চাক নামে এক চাক যুবক ও দুই চাকমা যুবক নিয়ে গঠিত অপহরণকারী দলটি ধরে ফেলে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, তারা কেবলমাত্র একটি চাঁদাবাজ দল। আরও জানা যায় যে, ক্যচাই চাক যখন রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন শুকরছড়ি কৃষি ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউটে লেখাপড়া করত তখন ইউপিডিএফ কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিল।

মহালছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক এক জুম্ম নারী খুন

৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়ি উপজেলাধীন সিন্ধুকছড়ি ইউনিয়নের সিন্ধুকছড়ি গ্রামে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক পনেমালা ত্রিপুরা (৫০) স্বামী- বিভীষণ ত্রিপুরা নামের এক জুম্ম নারী খুন হয়। ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সকালে গ্রামবাসীদের কর্তৃক তাদের জুম ক্ষেত থেকে পনেমালা ত্রিপুরার লাশ উদ্ধার করা হয়। চার চিহ্নিত সেটেলার বাঙালী এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়।

জানা যায়, এই বছর পনেমালা ত্রিপুরা ও স্বামী বিভীষণ ত্রিপুরা আরও বেশী ফসলের জন্য দু'টি জুম ক্ষেতে চাষাবাদ করে। বন্য পশু থেকে তাদের ফসল রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী তারা উভয়েই রাত্রে আলাদাভাবে অস্থায়ী জুম ঘরে থাকে। ঘটনার দিনও তারা সেভাবে অবস্থান নেয়। ঐ দিন সকালে স্বামী বিভীষণ ত্রিপুরা তার স্ত্রীকে ডাকলে যখন কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন তার মনে সন্দেহ ঘণীভূত হয় এবং তার স্ত্রীর জুমঘরে যায়। কিন্তু সেখানে পনেমালা ত্রিপুরাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তৎক্ষনাৎ সে স্থানীয় লোকজনকে খবর দেয় এবং তারা যৌথভাবে জুমক্ষেতের পাশ্ববর্তী জঙ্গলে খুঁজতে থাকে। শেষে তাদের জুমক্ষেত থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে পনেমালা ত্রিপুরার লাশ খুঁজে পায়।

ধারণা করা হচ্ছে যে, জুমক্ষেত থেকে পনেমালাকে অপহরণ করা হয় এবং রাত্রে খুন করা হয়। এই জুম ক্ষেতটি ত্রিপুরা গ্রাম থেকে দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটাও জানা যায় যে, নিম্নোক্ত সেটেলার বাঙালীদের সাথে ভূমি বিরোধ ছিলঃ

১. মোঃ আফসার গাজী পীং- হামিদ গাজী, গ্রাম- সিন্ধুকছড়ি;

২. খাইরুল ইসলাম পীং- মৃত আজগর আলী, গ্রাম- ঐ;

৩. রুস্তম আলী পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- ঐ;

৪. নোওয়াব আলী পীং- মৃত আফসার গাজী, গ্রাম- ঐ।

জানা যায়, উক্ত ব্যক্তিরা ২০০৬ সালে বেশ কয়েকবার পনেমালার জমি দখল করতে সেখানে যায়। সে সময় পনেমালার জমি দখল করতে না পারলেও সেটেলার বাঙালীরা পনেমালার লাগানো ব্যাপক ফলজ চারা ধ্বংস করে দেয়। ২০০৯ সালের ১০ মে তারিখেও সেটেলার বাঙালীরা পনেমালার জমি দখলের চেষ্টা করে। এই সময় তারা আবার অনেক গাছ কেটে দেয় এবং এমনকি নিজেরা কিছু চারা লাগায়। তারা পনেমালা ও তার স্বামীকে এই বলে হুমকী দেয় যে, যদি তারা জমিটি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের খুন করা হবে। পনেমালা ত্রিপুরা খাগড়াছড়ি জেলার সাংসদ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার কাছে লিখিত অভিযোগও দাখিল করে। সাংসদ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে মহালছড়ি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শরিফুল আরিফকে পনেমালা ত্রিপুরার এই অভিযোগটি পাঠিয়ে দেন। তবে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এখানে উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে একটি মামলা হলে গুইমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উপরোক্ত ৪ সেটেলার বাঙালীর সাথে ষোলো আনা ত্রিপুরা নামের এক নিরীহ ত্রিপুরা গ্রামবাসীর নামও জড়িত করে দেন। বস্তুতঃ মামলাটি দুর্বল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই নির্দোষ একজন ত্রিপুরার নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এদিকে জানা যায়, সিন্ধুকছড়ি জোনের সেনা কর্তৃপক্ষ ও গুইমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিহতের স্বামীসহ আত্মীয়দের চাপ দিচ্ছে যে, যাতে তারা সেটেলার বাঙালীদের সাথে বোঝাপড়ায় আসতে। রিপোর্টটি লেখা পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্তদের কাউকেই গ্রেফতার করেনি। অপরদিকে ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পুলিশ নিরীহ ষোলো আনা ত্রিপুরা (৩৮) পীং- সজল ত্রিপুরাকেই গ্রেফতার করে। অপরদিকে পনেমালার স্বামী বিভীষণ ত্রিপুরা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে ষোলো আনা ত্রিপুরা নির্দোষ বলে উল্লেখ করে তাকে ছেড়ে দেওয়ার দাবী করেছে। আর মূল দুস্কৃতিকারীরা খোলামেলাভাবে ঘোরাফেরা করলেও তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না।

সিন্ধুকছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক মারমা কিশোরী ধর্ষিত এবং পরে অপহৃত

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলাধীন সিন্ধুকছড়ি এলাকার নাকবাই পাড়ার মারমা কিশোরী আথুইবাই মারমা (১৩) পীং- মংসা থোয়াই মারমা মানিকছড়ি উপজেলাধীন জিয়ানগর গ্রামের মোঃ রিপন পীং- শাহজাহান পাটোয়ারী নামের এক সেটেলার বাঙালী কর্তৃক প্রথমে ধর্ষণের শিকার ও পরে অপহৃত হয়। জানা যায়, মোঃ রিপন একজন নির্মাণ শ্রমিক। সে নাকবাই গ্রামের পাশ্ববর্তী ধ্রুং ছড়ার কালভার্ট নির্মাণ কাজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল। ধর্ষণের শিকার আথুইবাই মারমার বাড়ী ঐ ধ্রুং ছড়ারই পাশে। মোঃ রিপন প্রায়ই পানি খাওয়ার নামে আথুইবাই মারমাদের বাড়ীতে যায়।

জানা যায়, ঐ দিন আথুইবাই মারমার মা পার্শ্ববর্তী এক বিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করতে গেলে আথুইবাই মারমা একা হয়ে পড়ে। এই সুযোগে দুস্কৃতিকারী মোঃ রিপন আথুইবাই মারমার বাড়ীতে যায় এবং গার্মেন্ট কারখানায় চাকুরী খোঁজার জন্য তার সাথে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। এক পর্যায়ে মোঃ রিপন আথুবাইকে ধর্ষণ করে এবং জোরপূর্বক অপহরণ করে।

জানা যায়, ধর্ষিতাকে নোয়াখালী জেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ মোঃ রফিক ও তাজুল ইসলাম নামের দুই পুলিশ কনষ্টেবল নোয়াখালীতে সন্দেহজনক ঘোরাফেরা করতে দেখে অপহৃত আথুইবাই মারমাসহ মোঃ রফিককে গ্রেফতার করে। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯ মোঃ রফিক ও অপহৃতাকে গুইমারা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঐ দিনই ধর্ষিতা ও অপহৃতার মা ম্যমা মারমা মোঃ রিপনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও অপহরণের মামলা করেন।

কাউখালীতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক ধারালো অস্ত্রের আঘাতে একটি চাকমা পরিবার আহত

১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সকাল প্রায় ১:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলাধীন ছোটো দুলুপাড়ায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক একটি চাকমা পরিবার ধারালো অস্ত্রের কোপের শিকার হয়। জানা যায়, পরিবারের প্রধান বসুদেব চাকমা ওরফে বোবা (৩৫) পীং- বুদ্ধমনি চাকমা মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং পরে তাকে কাউখালী উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সিন্ধুকছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক ত্রিপুরা নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলাধীন সিন্ধুকছড়ি এলাকার মুসলীম পাড়ার মোঃ আলমগীর পীং- আলতাফ মুন্সী নামের এক সেটেলার বাঙালী সিন্ধুকছড়ি এলাকার মনজয় কার্বারী পাড়ার নোমের বালা ত্রিপুরা (১৮) স্বামী- শহিত কুমার ত্রিপুরা নামের এক জুম্ম নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

জানা যায়, ঐ দিন সকাল প্রায় ১১:০০ টায় নোমের বালা ত্রিপুরা সিন্ধুকছড়ির ছোট মুরাপাড়ার জুমক্ষেতে তার বাবার জন্য দুপুরের খাবার নিয়ে যাচ্ছিল, এ সময় মোঃ আলমগীর নোমের বালা ত্রিপুরার পথ রোধ করে এবং তার সাথে কথা বলে কাছে ঘেষার চেষ্টা করে। কাছে ঘেষতে ব্যর্থ হলে আলমগীর পেছন থেকে নোমের বালা ত্রিপুরাকে আঘাত করে। এতে নোমের বালার হাত থেকে খাবারের ঝুড়িটি মাটিতে পড়ে যায়। এ সময় নোমের বালা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু আলমগীর তাকে পেছন থেকে ধরে ফেলে। হাতাহাতির এক পর্যায়ে, নোমের বালা নগ্ন হয়ে পড়ে এবং দুস্কৃতিকারী আলমগীর তাকে পাইচংছড়া পাহাড়ের নীচে টেনে নিয়ে যায়। এরপর আলমগীর নোমের বালাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা এবং গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করে। চিৎকার শুনে নোমের বালার বাবা মতিন্দ্র কুমার ত্রিপুরা ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যায়। নোমের বালার বাবার উপস্থিতি টের পেয়ে, মোঃ আলমগীর দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। নোমের বালা নাক ও মুখসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

মেয়েকে উদ্ধার করে নোমের বালার বাবা সিন্ধুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে যায় এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সামনে এ ব্যাপারে অভিযোগ করে। এ সময় গুইমারা থানার এস আই রাশেদুল ইসলাম ভূঁইয়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ঐদিন নোমের বালা দুস্কৃতিকারী আলমগীরের বিরুদ্ধে ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (সংশোধন) আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দুস্কৃতিকারীকে গ্রেফতার করেনি।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯ দুর্বার নেটওয়ার্ক ও কয়েকটি নারী সংগঠন নিম্নোক্ত তিনটি ঘটনাসহ জুম্ম নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। যেমন-

(১) ৩১ জুলাই ২০০৯ দীঘিনালায় গ্রামীন ব্যাংকের কর্মচারী নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রতিবন্ধী এক চাকমা নারীকে ধর্ষণ;

(২) ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সিন্ধুকছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক পনেমালা ত্রিপুরাকে হত্যা;

(৩) ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ মোঃ আলমগীর কর্তৃক ত্রিপুরা তরুণীকে ধর্ষণ ও অপহরণ।

এই মানবাধিকার বিষয়ক দলগুলো উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত সেটেলার বাঙালীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানায়।

সেনাবাহিনীর সিভিল সংক্রান্ত বিষয়ে নাক গলানো এবং কেবল সেটেলারদের উপর গুরুত্ব প্রদান

২০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ রাঙ্গামাটি সদর সেনা জোনের জোন কম্যান্ডারের পক্ষে মেজর মইনুদ্দিন শামীম সেটেলার বাঙালীদের জন্য সিভিল উন্নয়ন প্রকল্প পাঠাতে অনুরোধ জানিয়ে রাঙ্গামাটি সদর জোনের অধীন সকল সেনাক্যাম্প সমূহের বরাবরে একটি চিঠি পাঠান। রাঙ্গামাটি সেনা জোনের চিঠি, মেমো নং ৩২২/২/জিএস(১)শান্তকরণ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯-এর বরাত দিয়ে উক্ত চিঠি প্রেরণ করা হয়।

চিঠিতে বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় ইন্টিগ্রেটেড কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইসিডিপি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। চিঠিতে সংশ্লিষ্ট সেনাক্যাম্পের আধীন বসবাসকারী সেটেলার বাঙালীদের জন্য সম্ভাব্য প্রকল্প প্রস্তাব পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়। চিঠিতে এও উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বরাবরে পাঠাতে হবে। সেনাজোন কর্তৃপক্ষ আবার অন্য কোন এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে এমন প্রকল্পে সেটেলার বাঙালীদের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব পাঠাতে ক্যাম্পসমূহকে অনুরোধ জানায়। এই চিঠিতে প্রমানিত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনী কেবলমাত্র বাঙালী সেটেলারদের জন্যই কাজ করছে। চিঠির মেমো নাম্বারে 'শান্তকরণ' শব্দটি উল্লেখ করা হয়। এর অর্থ এই যে, সেনাবাহিনী শান্তকরণ প্রকল্পের অধীনে সেটেলার বাঙালীদের সাহায্য করে আসছে, সে প্রকল্পের অধীনে সেনাবাহিনী প্রতিবছর ১০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য (চাল) বরাদ্দ পায়।

বান্দরবানের জেলা প্রশাসক কর্তৃক হেডম্যানের বরাবরে বেআইনী চিঠি প্রেরণ

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ বান্দরবান জেলার জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান তার কাছ থেকে অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে কোন দলিল প্রদান না করার নির্দেশ নিয়ে বান্দরবানের সকল হেডম্যানকে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। এই চিঠি প্রেরণ পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর অধিকারের পরিপন্থী। তিনি হাস্যকরভাবে এই হুমকীও দেন যে, যদি কোন হেডম্যান এই ধরণের দলিল প্রদান করে তাহলে তাকে তার হেডম্যান পদ থেকে অপসারণ করা হবে।

উল্লেখ্য যে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের হেডম্যানদের যে কোন মৌজা অধিবাসীকে ০.৩০ একর ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান করার এবং সেই অনুযায়ী সে ব্যক্তিকে ভূমি দলিল প্রদান করার অধিকার রয়েছে।

এটাও উল্লেখ্য যে, কোন মৌজার আওতাধীন ভূমি ঐ মৌজাবাসীদের সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণ ভূমি যৌথ অধিকার নিয়ে আদিবাসীদের জুম্মদের মালিকানাধীন। এই এলাকাসমূহের উপর তাদের সাধারণ মালিকানার কারণে এই ভূমি ও

ইহার সম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকার রয়েছে এবং এই এলাকাগুলোতে ঐতিহ্যবাহী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেমন, মাছধরা, শিকার, সংগ্রহ ইত্যাদি পরিচালিত হয়। জুমভূমিগুলোও এই শ্রেণীতে পরে, যেমন পড়ে বাগান-বাগিচা ও চারণভূমি ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত ভূমিগুলো। বনগুলোও মৌজা সাধারণ শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত এবং প্রবেশ, ব্যবহার ও উত্তোলনের সমান অধিকার নিয়ে সেগুলো আদিবাসী সমাজের সাধারণ সম্পত্তি।

তবে, আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং হেডম্যানের অধিকার ও দায়িত্বকে লংঘন করে বান্দরবানের জেলা প্রশাসক উপরোক্ত চিঠি প্রেরণ করেন। তিনি একদেশদর্শীভাবে এই ভূমিসমূহ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন বলে দাবী করেছেন।

স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, যখনই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভূমি কমিশনের কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখনই বান্দরবান জেলার জেলা প্রশাসক এই সমস্ত কর্মকান্ড শুরু করেছেন।

লক্ষীছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্ম ঘরবাড়ী ভস্মীভূত

২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ রাতে খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষীছড়িতে সেটেলার বাঙালীরা ৩টি জুম্ম বাড়ী আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। জানা যায়, মঘাইছড়ি থেকে সেটেলার বাঙালীদের একটি দল ধুল্যাতলী ইউনিয়নাধীন বানিয়ামাছড়া গ্রামে রাত্রিকালীন হামলা করে এবং বাড়ীগুলো জ্বালিয়ে দেয়। ভস্মীভূত বাড়ীর মালিকরা হলেন- (১) ন্যায়বো চাকমা (৫৫) পীং- নয়নসেন চাকমা, (২) রসিক চাকমা (৩৩) পীং- ন্যায়বো চাকমা ও (৩) সুদিক্যা চাকমা (৩০) পীং- মনোকুমার চাকমা। তাদের বাড়ীর সকল জিনিসপত্র পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসক কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য লয়েল ডেভিড বমকে বেআইনী চিঠি

২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯ বান্দরবান জেলার জেলা প্রশাসক জেলার রুমা উপজেলাধীন পানতলা মৌজার চিম্বুক-থানচি সড়কে সিতাপাহাড়ে আদিবাসী যাদুঘরের জন্য ভবন নির্মাণ বন্ধ করতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য লয়েল ডেভিড বমকে বেআইনী চিঠি প্রেরণ করেন। জেলা প্রশাসক দাবী করেন যে, অনুমতি ছাড়া সরকারী ভূমির উপর ভবন নির্মাণ অবৈধ। তবে ডেভিড বম পানতলা মৌজার হেডম্যান লুমলাই ম্রো ও জুম্ম গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অনুমতি/সুপারিশ পেয়েছেন এবং এই ভূমি রেকর্ডভূক্ত করার জন্য আবেদন করেছেন।

বিলাইছড়িতে প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য অপহৃত

২ অক্টোবর ২০০৯ সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাগত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য এবং বর্তমানে সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার সহ সভাপতি শ্রী বিমলানন্দ চাকমা ওরফে গালিভার (৬২) পীং মেরেয়্যা চাকমাকে রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার কেরংছড়ি গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বিমলানন্দ চাকমাকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি। জানা গেছে, অপহরণকারী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বিমলানন্দ চাকমার পরিবারকে বলেছে বিমলানন্দের জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে। আত্মীয়রা এখন ধারণা করছেন যে, বিমলানন্দ চাকমাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি শহর এলাকায় সন্ত্রাসী কর্তৃক সুমেত চাকমা গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত

৩ অক্টোবর ২০০৯ সন্ধ্যা ৮.৩০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার তাতু রায় পাড়ার (পাবলিক হেলথ এলাকা) বাসিন্দা সুমেত চাকমা (৩৫) পীং যামিনী মোহন চাকমাকে তার বাড়ীর নিকটবর্তী স্থানে অজ্ঞাতনামা সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গুলি করে। পেটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে প্রথমে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ও পরে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসার পর সুমেত চাকমা বিপদমুক্ত হয় বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, সুমেত চাকমা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাবেক নেতা। তবে, বর্তমানে সে বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত।

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্য কর্তৃক নিরীহ মারমা ছাত্র আহত

১৪ অক্টোবর ২০০৯ ইউপিডিএফ-র সন্ত্রাসী সদস্যরা চইহ্লা মারমা (২০) পীং- অজ্ঞাত নামের এক নিরীহ মারমা ছাত্রকে নিষ্ঠুরভাবে মারধর করেছে। উল্লেখ্য, চইহ্লা মারমা পড়াশোনার পাশাপাশি উপার্জনের জন্য খাগড়াছড়িতে একটি গ্যারেজেও কর্মচারী হিসেবে

কাজ করে। জানা যায়, ঐ দিন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়িতে সড়ক অবরোধ পালন করছিল। সড়ক অবরোধের সময় চইহ্লা মারমা যখন বাইসাইকেল যোগে বাড়ীতে যাচ্ছিল, তখন ইউপিডিএফ-র পিকেটাররা তাকে ধরে ফেলে এবং তারপর তাকে নিষ্ঠুরভাবে মারধর করে। এতে চইহ্লা মারমা মাথায় মারাত্মক আঘাত পায়। তাকে প্রথমে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে মারাত্মক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এতে নিরীহ এই ছাত্রকে নিষ্ঠুর প্রহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মারমা সমাজ একটি মিছিল বের করে।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক এসএসসি পরিক্ষার্থী এক ত্রিপুরা ছাত্রী নিগৃহীত

১৫ অক্টোবর ২০০৯ সকাল ১১.০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা ইউনিয়নাধীন বাইল্যাছড়ির আরবারী গ্রামের যশোবালা ত্রিপুরা (১৭) পীং- দুগল ত্রিপুরা নামের স্কুলগামী এক ত্রিপুরা বালিকা মাটিরাঙ্গা উপজেলার রসুলপুর নামক সেটেলার গ্রামের মোঃ হোসেন পীং- জাসমত আলী নামের এক সেটেলার বাঙালী কর্তৃক নিগ্রহের শিকার হয়। যশোবালা ত্রিপুরা মাটিরাঙ্গা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের এক এসএসসি পরীক্ষার্থী। ইহাও জানা যায় যে, জনৈক সেটেলারদের নেতা দুস্কৃতিকারী মোঃ হোসেনকে লাঠিপেটা করেন এবং গুইমারা ইউনিয়ন পরিষদের কাউন্সিলর রেনুবালা ত্রিপুরাসহ জুম্ম নেতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পানছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক ত্রিপুরা স্কুল শিক্ষিকার শ্লীলতাহানির চেষ্টা

১৮ অক্টোবর ২০০৯ সকাল ১১:০০ টায় অজ্ঞাত দুই সেটেলার বাঙালী খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলাধীন পানছড়ি মৌজার ওয়াদুক পাড়ার সিন্ধু কার্বারী পাড়া গ্রামের ইউনিসেফ পাড়া কেন্দ্রের আনুমানিক ১৮ বছর বয়সী ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের এক প্রি-প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। উল্লেখ্য, সে সময় ঐ শিক্ষিকা ছড়ার পাশে গোসল করছিল।

জানা যায়, ঐ ত্রিপুরা শিক্ষিকা গোসল করার সময় হঠাৎ দুই সেটেলার বাঙালী ছড়ায় আসে এবং ত্রিপুরা শিক্ষিকার মুখ চেপে ধরে ছুরি দেখিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু শিক্ষিকা চিৎকার করার এক পর্যায়ে দুস্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়। ধর্ষণ চেষ্টার শিকার ত্রিপুরা শিক্ষিকা জানায়, নাম উল্লেখ করতে না পারলেও চেহারায় সে ঐ সেটেলার বাঙালীদের চেনে। জানা যায়, এ ব্যাপারে খাগড়াছড়ির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জুরাছড়ি ও বরকলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক নিরীহ গ্রামবাসী প্রহৃত

২২ অক্টোবর ২০০৯ সন্ধ্যায় রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলাধীন বরকল উপজেলা সীমান্তবর্তী গ্রাম পানছড়ি আদামে কান্তি চাকমা (৩৬) পীং- অজ্ঞাত নামের এক নিরীহ গ্রামবাসী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক বেদম প্রহারের শিকার হন।

অপরদিকে, ২৪ অক্টোবর ২০০৯ সন্ধ্যা ৭:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলার বরকল বরকল উপজেলাধীন ৩নং আইমাছড়া ইউনিয়নের সাক্রাছড়ি গ্রামের মলেন্দ্র চাকমা (৩০) পীং- ইন্দ্রমোহন চাকমা নামের এক নিরীহ গ্রামবাসী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক মারধরের শিকার হয়। তার অপরাধ, সে নাকি চুক্তির সমর্থক লোককে ভাত খাইয়েছে।

বাঘাইছড়ির সিজকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীর গুলিতে নিরস্ত্র জেএসএস নেতা টিপু চাকমা খুন

গত ২৩ অক্টোবর ২০০৯, সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন খেদারমার ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক ও খেদারমারা ইউনিয়নের উত্তর পাবলাখালী গ্রামের বাসিন্দা টিপু চাকমা (৩৩) পীং- ইন্দ্রসেন চাকমা কয়েকজন বন্ধুসহ শিজক বাজারে গেলে এক পর্যায়ে তপন জ্যোতি চাকমা (৩৫) ও বসুদেব চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-এর ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি সন্ত্রাসী দল সশস্ত্রভাবে বাজারে উপস্থিত হয়। এ সময় তারা টিপু চাকমাকে পেলে শিজক বাজার সংলগ্ন ব্রীজের কাছে নিয়ে গিয়ে গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং সাথে সাথে বন্দুকের তিনটি ফাঁকা গুলি ছোঁড়ার পর বুকের দু'পাশে দুটি বন্দুক ঠেকিয়ে টিপু চাকমাকে গুলি করে হত্যা করে। ময়নাতদন্তের জন্য ঐ দিনই নিহতের লাশ রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে নিয়ে আনা হয় এবং পরদিন সকালে তা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য নিহতের গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়।

জুরাছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক দুই মহিলাকে আটক রেখে হয়রানি

২৭ অক্টোবর ২০০৯ রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলাধীন জুরাছড়ি বাজার থেকে জুরাছড়ির কুসুমছড়ি এলাকার বাসিন্দা তুফান চাকমা ওরফে অগ্নি (৪৮)-র নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-র সন্ত্রাসীরা (১) গুপতারা চাকমা ওরফে ঘোচ্ছ্যাহলা (৩৬) স্বামী- বিকাশ চাকমা

ও (২) মহারাণী চাকমা (৩২) স্বামী- চিরঞ্জীব চাকমা নামের দুই মহিলাকে ধরে ঐ দিন সারারাত আটক রেখে পরদিন বিকালে ছেড়ে দেয়। উল্লেখ্য, গুপতারার স্বামী বিকাশ চাকমা একজন প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য। হয়রানির স্বীকার উক্ত দুই মহিলা বরকল উপজেলার আইমাছড়া ইউনিয়নের সাক্রাছড়ি-সম্মুনিপাড়ার বাসিন্দা।

চট্টগ্রামের সোনাইছড়িতে দুস্কৃতিকারী কর্তৃক ত্রিপুরা নারী ধর্ষণের শিকার

৩০ অক্টোবর ২০০৯ রাঙ্গামাটি থেকে আত্মীয়র বাড়ীতে বেড়াতে আসা ১৯ বছর বয়সী এক ত্রিপুরা নারী সীতাকুন্ড উপজেলাধীন সোনাইছড়ি ইউনিয়নের কেশবপুরের পাহাড়ী এলাকায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জহুর ও তার ৭ সহযোগী কর্তৃক গণধর্ষণের শিকার হয়। বিকালে দুস্কৃতিকারীরা জোরপূর্বক ঐ মেয়েকে পাহাড়ী এলাকায় নিয়ে যায়। পরদিন সকালে তার আত্মীয়-স্বজন মেয়েটিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে এবং তারপর সীতাকুন্ড থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সীতাকুন্ড থানায় একটি মামলা দায়ের করার পর চিকিৎসক কর্তৃক মেয়েটিকে পরীক্ষা করা হয়। যে সমস্ত দুস্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয় তারা হল- (১) জহুর মেম্বার (৪৫), (২) সুমন (২৮), (৩) হান্নান (৩২), (৪) নুরুজ্জামান (৪২), (৫) শামীম (৩২), (৬) সেলিম (৩৪) ও (৭) মোনা (৪৫)। সবাই তারা চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নাধীন কেশবপুর গ্রামের বাসিন্দা।

বরকলে ইউপিডিএফ কর্তৃক দুই নিরীহ গ্রামবাসী প্রহৃত, একজন মারাত্মক জখম

গত ৩ নভেম্বর ২০০৯ বিকাল ৫:০০ টায় জেরীন চাকমা (৩৫), কনক চাকমা (৩৩) ও তুফান চাকমা (৪৮)-র নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী ইউপিডিএফ-র ৩৫ জনের সশস্ত্র একটি দল রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন ৩নং আইমাছড়া ইউনিয়নের মদনপাড়া গ্রামে হানা দিয়ে দুই নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে বেদম প্রহার করেছে। প্রহৃত দুই ব্যক্তি হলেন- (১) রক্তোৎপল চাকমা (৩৬) পীং- বীরসেন চাকমা ও (২) শান্তনু চাকমা (২৮) পীং- করুণা লাল চাকমা। দু'জনের মধ্যে প্রথমজন মারাত্মক জখম হয়ে বাড়ীতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে দেওয়া হয়নি। ইউপিডিএফ-র মতে প্রহৃত দু'জনের অপরাধ হলো, তারা নাকি গণলাইন দেয়নি।

১০ই নভেম্বর
অমর শহীদদের
রক্ত
বৃথা যেতে
দেব না

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ১০ই নভেম্বর ২০০৯ রাঙ্গামাটি হতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।